আঁধারে আলো

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৯

মুদ্রাকর ঃ
তাপস কুমার হাটাই
নিউ তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

আঁধারে আলো

এক

সে অনেকদিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে; বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ি গিয়াছিল তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—বাবা, কথা শোন্, একবার দেখে আয়।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোনমতেই পারব না। তা হলে পাস হতে পারব না।

কেন পারবি নে? বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া করবি কলকাতায়, পাস হতে তোর কি বাধা হবে আমি ত ভেবে পাইনে, সতু!

না মা, সে সুবিধে হবে না—এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, যাস্‌নে দাঁড়া, আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েচি বাবা, আমার মান রাখবি নে?

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না জিজ্ঞাসা করে কথা দিলে কেন?

ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন, সে আমার দোষ হয়েছে, কিন্তু তোকে ত মায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে। তা ছাড়া, বিধবার মেয়ে, বড় দুঃখী—কথা শোন্ সত্য, রাজী হ।

আচ্ছা, পরে বলব, বলিয়া সত্য বাহির হইয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাত-আট বৎসর হইল স্বামীর কাল হইয়াছে,

তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারি শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয়-আশয়ে কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না। জননী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাস করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্রবধূর হাতে জমিদারি এবং সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর এ বাটীতে এতদিন পর্যন্ত কোন কাজকর্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রত উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃত অতুল মুখুয্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটিকে তাঁহার বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী, তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী তাহাও তিনি দুই-চারিটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, আগে ত মেয়ে দেখাই, তার পর কেমন না পছন্দ হয়, দেখা যাবে।

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের জায়গার ঠিক সুমুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীঠাকরুণটিকে হীরা-মুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, খেতে ব'স্।

সত্যর চমক ভাঙ্গিল। সে থতমত খাইয়া বলিল, এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও।

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই ত আর সত্যিই বিয়ে করতে

যাচ্ছিস নে—ঐ একফোঁটা মেয়ের সামনে তোর আর লজ্জা কি!

আমি কারুকে লজ্জা করিনে, বলিয়া সত্য প্যাঁচার মত মুখ করিয়া সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল। মা চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোনমতে নাকেমুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং পাশার চক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি কিছুতেই বসতে পারব না—আমার ভারী মাথা ধরেচে। বলিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া তাকিয়া মাথায় দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া দাবা পাতিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক চেঁচামেচি ঘটিল, কিন্তু সত্য একবার উঠিল না, একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল, কে জিতিল। আজ এ-সব তাহার ভালই লাগিল না।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল, ভাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস যে রে?

শুতে নয়, পড়তে যাচ্ছি। এম. এ.'র পড়া সোজা নয় ত! সময় নষ্ট করলে চলবে কেন? বলিয়া সে গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুমদুম শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা কাটিয়াছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা, চেয়ারে হেলান দিয়া, উপরের দিকে মুখ করিয়া কড়িকাঠ ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সে কান খাড়া করিয়া শুনিল—ঝুম্। আর একমুহূর্ত—ঝুমঝুম। সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই আপাদমস্তক গহনা-পরা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মত

মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আপনার মত জিজ্ঞেসা করলেন।

সত্য মুহূর্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কার মা?

মেয়েটি কহিল, আমার মা।

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল. তোমার নাম কি?

আমার নাম রাধারানী, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দুই

একফোঁটা রাধারানীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সত্য এম. এ. পাস করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ত কোন মতেই না, খুব সম্ভব, পরেও না। সে বিবাহই করিবে না। কারণ, সংসারে জড়াইয়া গিয়া মানুষের আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন কি একরকম করিয়া ওঠে, কোথাও কোন নারীমূর্তি দেখিলেই আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া তাহাকেই আবৃত করিয়া দিয়া, একাকী বিরাজ করে; সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মীর প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারে না। চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন; অকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে, পথে-ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়সের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন কোনমতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ,

হয়ত অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ বারংবার শিহরিয়া উঠে, সে তৎক্ষণাৎ যে-কোন একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভালবাসিত। তাহার চোরবাগানের বাসা হইতে গঙ্গা দূর নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায় আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুষ্ক বস্ত্র জিম্মা রাখিয়া জলে নামিত, তাহারই উদ্দেশে আসিতে গিয়া, একস্থানে বাধা পাইয়া স্থির হইয়া দেখিল, চার-পাঁচজন লোক একদিকে চাহিয়া আছে। সত্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, একসঙ্গে এত রূপ সে আর কখনও নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশের বেশী নয়। পরনে সাদাসিধা কালাপেড়ে ধুতি, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিত, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে, এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা একমনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা সত্যর কাছে যথেষ্ট প্রণামী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদমুখের খাতির ত্যাগ করিয়া হাতের ছাঁচ ফেলিয়া দিয়া 'বড়বাবু'র শুষ্ক বস্ত্রের জন্য হাত বাড়াইল।

দু'জনের চোখাচোখি হইল। সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সাঁতার কাটা হইল না, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া যখন সে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য উপরে উঠিল, তখন সেই অসামান্যা রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্তদিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল, এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এমনি সজোরে

টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া, আলনা হইতে একখানি বস্ত্র টানিয়া লইয়া গঙ্গাযাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছেন। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসিল, তখন পূর্বদিনের মত আজিও তিনি ললাট চিত্রিত করিতেছিলেন। আজিও চারি চক্ষু মিলিল, আজিও তাহার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল; সে কোনমতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

তিন

রমণী যে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু—পূর্বে সত্য নিজে কতকটা বেলা করিয়াই স্নানে আসিত।

জাহ্নবীতটে উপর্যুপরি আজ সাতদিন উভয়ের চারি চক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু মুখের কথা হয় নাই। বোধ করি তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রূপসী যেই হোন, তিনি যে চোখ দিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করিয়াছেন, এবং সে বিদ্যায় পারদর্শী, সত্যর অন্তর্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল, 'একবার শুনুন!' মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে লাইনে ওপারে সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম কক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিতলের কলস, দক্ষিণ হস্তে সিক্তবস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। সত্য এদিক-ওদিক চাহিয়া

কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তিনি উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া করে একটু যদি এগিয়ে দেন ত বড় ভালো হয়।

অন্যদিন তিনি দাসী সঙ্গে করিয়া আসেন, আজ একা। সত্যের মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাজটা ভাল নয় বলিয়া একবার মনেও হইল, কিন্তু সে 'না' বলিতেও পারিল না। রমণী তাহার মনেব ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসি যাহাবা হাসিতে জানে, সংসারে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উহার অনুসরণ করিল। দুই-চারি পা অগ্রসব হইয়া রমণী আবার কথা কহিলেন, ঝির অসুখ, সে আসতে পারলে না, কিন্তু আমিও গঙ্গাস্নান না করে থাকতে পারিনে—আপনারও দেখচি এ বদ অভ্যাস আছে।

সত্য আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।

এখানে কোথায় আপনি থাকেন?

আমাদের বাড়ি জোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাবেন।

তাই যাব।

বহুক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হইল না। চিৎপুর রাস্তায় আসিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন, কাছেই আমাদের বাড়ি—এবার যেতে পারব—নমস্কাব।

নমস্কার, বলিয়া সত্য ঘাড় গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহাব বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানান অসাধ্য। যৌবনে পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনি বুঝিবেন, সেদিন কি হইয়াছিল। সবাই বুঝিবেন

না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস—সব রাঙ্গা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি কবিযা চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বক-শলাকার মত শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা ব্যথার তবঙ্গ তাহাব কণ্ঠ পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া গডাইয়া গেল; সে নিশ্চিত বুঝিল, আজিকার দিনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। চাকরটা সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, হারামজাদা, এত বেলা হয়েছে, তুলে দিতে পাবিস নি? তোব এক টাকা জরিমানা।

সে বেচাবা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিযা রহিল। সত্য দ্বিতীয বস্ত্র না লইয়াই রুষ্ট-মুখে বাসা হইতে বাহিব হইয়া গেল।

পথে আসিযা গাড়ি ভাড়া করিল এ গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকাইতে হুকুম কবিযা, রাস্তার দুইদিকেই প্রাণপণে চোখ পাতিয়া রাখিল। কিন্তু গঙ্গাথ আসিযা, বাটেব দিকে চাহিতেই তাহাব সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বরঞ্চ মনে হইল, যেন অকস্মাৎ পথের উপরে নিক্ষিপ্ত একটা অমূল্য বত্ন কুডাইযা পাইল।

গাডি হইতে নামিতেই তিনি মৃদু হাসিযা নিতান্ত পবিচিতের মত বলিলেন, এত দেরি যে? আমি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি—শিগগির নেয়ে নিন, আজও আমাব ঝি আসেনি।

এক মিনিট সবুর করুন, বলিয়া সত্য দ্রুতপদে জলে গিয়া নামিল সাঁতার কাটা তাহাব কোথায় গেল! সে কোনমতে গোটা দুই-তিন ডুব দিয়া ফিবিয়া আসিয়া কহিল, আমার গাড়ি গেল কোথায়?

রমণী কহিলেন, আমি তাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় কবেচি।

আপনি ভাড়া দিলেন!

দিলামই বা। চলুন। বলিয়া আর একবার ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া অগ্রবর্তিনী হইলেন।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে যত নিরীহ, যত অনভিজ্ঞই হোক, একবারও সন্দেহ হইত —এ সব কি!

পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, কোথায় বাসা বললেন, চোরবাগানে?

সত্য কহিল, হাঁ।

সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে?

সত্য আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

আপনি ত চোরের রাজা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া আবার নিবাক নরাল-গমনে চলিতে লাগিলেন। আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল্ ছলাৎ-ছল্ শব্দে—অর্থাৎ, ওরে মুগ্ধ—ওরে অন্ধ যুবক! সাবধান! এ-সব ছলনা—সব ফাঁক, বলিয়া উছলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ, একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।

মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া সত্য সসঙ্কোচে কহিল, গাড়ি-ভাড়াটা—

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, সে ত আপনার দেওয়াই হয়েচে।

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, আমার দেওয়া কি করে?

আমার আর আছে কি যে দেব! যা ছিল সমস্তই ত তুমি চুরি-ডাকাতি করে নিয়েচ। বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া, বোধ করি উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

এ অভিনয় সত্য দেখিতে পায় নাই, তাই এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎরেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্তে সাধ

হইল, এই প্রকাশ্য রাজপথেই ওই দুটি রাঙ্গা পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু চক্ষেব নিমিষে গভীব লজ্জায় তাহার মাথা এমনি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ তুলিয়া একবার প্রিয়তমাব মুখেব দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীবে ধীরে চলিয়া গেল।

ও-ফুটপাতে তাহার আদেশমত দাসী অপেক্ষা কবিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চ কেন? বলি, কিছু আছে টাছে? দু'পয়সা টানতে পারবে ত?

রমণী হাসিয়া বলিল, তা জানিনে, কিন্তু হাবাগোবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুবোতে আমার বেশ লাগে।

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, এতও পার তুমি! কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখতে যেন রাজপুত্তুর! যেমন চোখমুখ, তেমনি রঙ। তোমাদের দুটিকে দিব্যি মানায়--দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলে, যেন একটি জোড়া-গোলাপ ফুটে ছিল।

রমণী মুখ টিপিয়া বলিল, আচ্ছা চল্। পছন্দ হয়ে থাকে ত না হয় তুই নিস্।

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, না দিদিমণি, ও জিনিস প্রাণ ধবে কাউকে দিতে পারবে না, তা বলে দিলুম।

চার

জ্ঞানীরা কহিয়াছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখিলেও বলিবে না, কারণ, অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না। এই অপবাধেই শ্রীমন্ত বেচারা নাকি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক, ইহা অতি সত্য কথা, সত্য লোকটা সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন্ পড়িয়াছিল এবং ডন্ জুয়ানের বাঙলা তর্জমা করিতে বসিয়াছিল। অতবড় ছেলে, কিন্তু একবারও এ সংশয়ের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনের বেলা শহরের

পথেঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা সে বানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা নিরাপদ কি না।

দিন-দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে অপরিচিতা সহসা কহিল, কাল রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম, সরলার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়—না?

সত্য সরলা প্লে দেখে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল, আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, কি ভয়ানক কষ্ট! আচ্ছা, সরলাই বা তার স্বামীকে এত ভালবাসলে কি করে, আর তার বড়জা-ই বা পারেনি কেন বলতে পার?

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, স্বভাব।

রমণী কহিল, ঠিক তাই! বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু সব স্ত্রী-পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাসতে পারে? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্যন্ত ভালবাসা কি, জানতেও পায় না। জানবার ক্ষমতাই তাদের থাকে না। দেখনি, কত লোক গান-বাজনা হাজার ভাল হলেও মন দিয়ে শুনতে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না—রাগতে পারেই না! লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে, আমার কিন্তু নিন্দে করতে ইচ্ছে করে।

সত্য হাসিয়া বলিল, কেন?

রমণী উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, তারা অক্ষম বলে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দোষটাই বেশী। এই যেমন সরলার ভাশুর,—স্ত্রীর অতবড় অত্যাচারেও তার রাগ হ'ল না।

সত্য চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনরায় কহিল, আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি শয়তান মেয়েমানুষ! আমি থাকতুম ত রাক্ষসীর গলা টিপে দিতুম।

সত্য সহাস্যে কহিল, থাকতে কি করে? প্রমদা বলে সত্যই ত কেউ ছিল না,—কবির কল্পনা—

রমণী বাধা দিয়া কহিল, তবে অমন কল্পনা করা কেন? আচ্ছা, সবাই বলে, সমস্ত মানুষের ভেতরেই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না যে, তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন। সত্যি বলচি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকের বই পড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, তা না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—বিশ্বাস হয় যে সত্যিই সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে।

সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড়?

রমণী কহিল, ইংরেজী জানিনে ত, বাংলা বই যা বেরোয়, সব পড়ি। এক-একদিন সারারাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চল না আমাদের বাড়ি, যত বই আছে সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ি?

হাঁ, আমাদের বাড়ি—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না ছি ছি,—

ছি ছি কিছু নেই—চল।

না না, আজ না—আজ থাক, বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ তাহার এই অপরিচিতা প্রেমাস্পদার উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধার ভারে তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল।

পাঁচ

সকালবেলা স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চারদিন গত হইয়াছে, সেই অপরিচিতা প্রিয়তমাকে সে দেখিতে পায় নাই—আর তিনি গঙ্গাস্নানে আসেন না।

আকাশ-পাতাল কত কি যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে এ দুশ্চিন্তাও মনে উঠিয়াছে, হয়ত তিনি বাঁচিয়াই নাই, হয়ত বা মৃত্যুশয্যায়! কে জানে!

সে গলিটা জানে বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ি. কোথায় বাড়ি, কিছুই জানে না। মনে করিলে অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই,—কেন সেই সনিবন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল?

সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনাকাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল—তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র বুকজোড়া স্নেহ।

বাবু!

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথেব ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, কি হয়েছে তাঁর?

বলিয়াই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল—সামলাইতে পারিল না।

দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ করি হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়াই বলিল, দিদিমণির বড় অসুখ, আপনাকে দেখতে চাইচেন।

চল, বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কি অসুখ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েছে কি?

দাসী কহিল, না তা হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।

সত্য মনে মনে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল, খুব বড় বাড়ি, দ্বারের কাছে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান ঝিমাইতেছে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না ত? তিনি ত আমাকে চেনেন না।

দাসী কহিল, দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছেন। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বাহিয়া তেতলার বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পাশাপাশি তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, মনে হইল, সেগুলি চমৎকার সাজান। কোণের ঘর হইতে উচ্চহাসির সঙ্গে তবলা ও ঘুঙুরের শব্দ আসিতেছিল। দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ ঘর—চলুন। দ্বারের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দা সরাইয়া দিয়া সু-উচ্চকণ্ঠে বলিল, দিদিমণি, এই নাও তোমার নাগর।

তীব্র হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল, তাহাতে সত্যর সমস্ত মস্তিষ্ক ওলট-পালট হইয়া গেল; তাহার মনে হইল, হঠাৎ সে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে, কোনমতে দোর ধরিয়া, সে সেখানেই চোখ বুজিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে মেঝেয় মোটা গদি-পাতা বিছানার উপর দু-তিনজন ভদ্রবেশী পুরুষ। একজন হারমোনিয়াম, একজন বাঁয়া-তবলা লইয়া বসিয়া আছে,—আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিনি? তিনি বোধ করি, এইমাত্র নৃত্য করিতেছিলেন; দুই পায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা, নানা অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ ভূষিত—সুরারঞ্জিত চোখ দুটি ঢুলঢুল,

করিতেছে; ত্বরিতপদে কাছে সরিয়া আসিয়া, সত্যর একটা হাত ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মিরগি ব্যামো আছে নাকি? নে ভাই, ইয়ারকি করিস নে, ওঠ্—ও-সবে আমার ভারী ভয় করে।

প্রবল তড়িৎস্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, ইহার করস্পর্শে সত্যর আপাদমস্তক তেমনি করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল, আমার নাম শ্রীমতী বিজ্‌লী—তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু?—

সমস্ত লোকগুলা হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে মেঝের উপর শুইয়া পড়িল—কি রঙ্গই জান দিদিমণি!

বিজ্‌লী কৃত্রিম রোষের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাম্, বাড়াবাড়ি করিস নে—আসুন, উঠে আসুন বলিয়া জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া, একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া, পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাত জোড় করিয়া শুরু করিয়া দিল—

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়েল
টুটুল সবহু সন্দেহা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।

অব সোপ্ন যবহু মরি পরিহোয়ত—

তবহুঁ মানব নিজ দেহা—

যে লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরমশাই, বড় পাতকী আমি—একটু পদরেণু—

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান করিয়া একখানা গরদের কাপড় পরিয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল, তাহার কতকটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, কেন বেচারাকে মিছামিছি সঙ্ সাজাচ্চ ?

বিজ্‌লী হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ, মিছামিছি কিসে ? ও সত্যিকারের সঙ বলেই.ত এমন আমোদের দিনে ঘরে এনে তোমাদের তামাশা দেখাচ্চি। আচ্ছা, মাথা খাস গাবু, সত্যি বল্ ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি ? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মও নই মোচলমান খ্রীষ্টানও নই। হিঁদুর ঘরের এতবড় ধাড়ী মেয়ে, হয় সধবা, নয় বিধবা—কি মতলবে চুটিয়ে পারিত করছিলি বল্ ত ? বিয়ে করবি বলে, না, ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে ?

ভারী একটা হাসি উঠিল। তার পর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল। সত্য একটিবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিবই বা কি করিয়া, আর বলিলে বুঝিবেই বা কে ? থাক্ সে।

বিজ্‌লী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, বেশ ত আমি ! যা ক্ষ্যামা, শিগ্‌গির যা—বাবুর খাবার নিয়ে আয় ; স্নান করে এসেচেন—বাঃ, আমি কেবল তামাশাই কচ্চি যে ! বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল পূর্বের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বহ্ন্যুত্তপ্ত কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সস্নেহ অনুতাপে যথার্থই জুড়াইয়া গেল।

খানিক পড়ে দাসী একথালা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজ্‌লী নিজের হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মুখ তোল, খাও।

এতক্ষণ সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সামলাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, আমি খাব না।

কেন? জাত যাবে? আমি হাড়ী না মুচি?

সত্য তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, তা হলে খেতুম। আপনি যা তাই।

বিজ্‌লী খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, হাবুবাবুও ছুরি-ছোরা চালাতে জানেন দেখচি! বলিয়া আবার হাসিল, কিন্তু তাহা শব্দ মাত্র, হাসি নয়, তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, আমার নাম সত্য, 'হাবু' নয়। আমি ছুরি-ছোরা চালাতে কখন শিখিনি, কিন্তু, নিজের ভুল টের পেলে শোধরাতে শিখেচি।

বিজ্‌লী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল, কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, আমার ছোঁয়া খাবে না।

না।

বিজ্‌লী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের স্বরে এবার তীব্রতা মিশিল; জোর দিয়া কহিল, খাবেই। এই বলচি তোমাকে, আজ না হয় কাল, না হয় দু'দিন পরে খাবেই তুমি।

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েছে: কিন্তু আপনারও ভুল হচ্চে। আজ নয়, আগামী জন্মে নয়—কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না। অনুমতি করুন, আমি যাই—আপনার নিঃশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে।

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এমনি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে, তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল,

বিজ্‌লীবিবি, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌! যেতে দাও—যেতে দাও—সকালবেলার আমোদটাই ও মাটি করে দিলে।

বিজ্‌লী জবাব দিল না, স্তম্ভিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথার্থই তাহার ভয়ানক ভুল হইয়াছিল। সে ত কল্পনাও করে নাই, এমনি মুখচোরা শান্ত লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজ্‌লী মৃদুস্বরে কহিল, আর একটু বসো।

মাতাল শুনিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, উঁ হুঁ হুঁ প্রথম চোটে একটু জোর খেলবে—যেতে দাও—যেতে দাও—সুতো ছাড়ো—সুতো ছাড়ো—

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল; বিজ্‌লী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, ওরা দেখতে পাবে, তাই, নইলে হাতজোড় করে বলতুম, আমার বড় অপরাধ হয়েচে—

সত্য অন্যদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনর্বার কহিল, এই পাশের ঘরটা আমার পড়ার ঘর। একবার দেখবে না? একটিবার এসো মাপ চাচ্চি।

না, বলিয়া সত্য সিঁড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজ্‌লী পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, কাল দেখা হবে?

না।

আর কি কখনো দেখা হবে না?

না।

কান্নায় বিজ্‌লীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল: ঢোঁক গিলিয়া জোর করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না। কিন্তু তাও যদি না হয়, বল এই কথাটা আমার বিশ্বাস করবে?

ভগ্নস্বর শুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনর-ষোল দিন ধরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে, তাহার কাছে ত ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে-মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিজ্‌লীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে করিবে কি? হায় হায়! প্রত্যয় করাইবার সমস্ত উপায়ই যে সে আবর্জনার মত স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে!

সত্য প্রশ্ন করিল, কি বিশ্বাস করব?

বিজ্‌লীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া ওঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল, কিন্তু অশ্রুর কি নকল নাই! বিজ্‌লী মুখ না তুলিয়াই বুঝিল, সত্য অপেক্ষা করিয়া আছে; কিন্তু সেই কথাটা যে মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতে পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য তাহার বুকের পাঁজরগুলো ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে!

সে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসার একটা কণা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে! সে যে দাগী আসামী। অপরাধের শতকোটি চিহ্ন সর্বাঙ্গে মাখিয়া বিচারের সুমুখে দাঁড়াইয়া, আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দোষ! যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে, কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে?

সত্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; সে বলিল, চললুম।

বিজ্‌লী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু এবার কথা কহিল। বলিল, যাও কিন্তু যে কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হয়ো না। বিশ্বাস করো,

সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না। একটু থামিয়া কহিল, সব মন্দিরেই দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সত্য ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না! বিজ্‌লী নর্তকী, তথাপি সে নারী! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা তাহার নারীদেহ! ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া, আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত, অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ঐ মাতালটা পর্যন্ত টের পাইল। সে-ই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল,—কি বাইজী, চোখের পাতা ভিজে যে! মাইরি, ছোঁড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখে দিলে না! দাও দাও, থালাটা এগিয়ে দাও হ্যাঁ, বলিয়া নিজেই টানিয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটি কথাও বিজ্‌লীর কানে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল খুললে যে?

বিজলী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পারব না বলে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আর না। বাইজী মরেছে—

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাইজী?

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য মরে গেল বন্ধু।

ছয়

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড়বাড়িতে জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন। খাওয়ানো-দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসর করিয়া আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গানের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

একধারে তিন-চারটি নর্তকী—ইহারাই নাচ-গান করিবে। দ্বিতলের বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারানী একাকী নীচের জনসমাগম দেখিতেছিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখনও শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিলেন, এত মন দিয়ে কি দেখচ বল ত?

রাধারানী স্বামীর দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিল, যা সবাই দেখতে আসচে—বাইজীদের সাজসজ্জা—কিন্তু, হঠাৎ তুমি যে এখানে?

স্বামী হাসিয়া জবাব দিলেন, একলাটি বসে আছ, তাই একটু গল্প করতে এলুম!

ইস্?

সত্যি! আচ্ছা, দেখচ ত, বল দেখি, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ হয়?

ঐটিকে, বলিয়া রাধারানী আঙুল তুলিয়া, যে স্ত্রীলোকটি

সকলের পিছনে নিতান্ত সাদাসিধা পোশাকে বসিয়ছিল তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিলেন, ও যে নেহাত রোগা।

তা হোক, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু, বেচারী গরীব—গায়ে গয়না-টয়না এদেব মত নেই।

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা হবে। কিন্তু, এদের মজুরি কত জান?

না।

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এদের দু'জনের ত্রিশ টাকা করে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে গরীব বলচ, তার দু শ টাকা।

রাধারানী চমকিয়া উঠিল—দু শ! কেন, ও কি খুব ভাল গান করে?

কানে শুনিনি কখনো। লোকে বলে, চার-পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত,—কিন্তু, এখন পারবে কিনা বলা যায় না।

তবে, অত টাকা দিয়ে আনলে কেন?

তার কমে ও আসে না। এতেও আসতে রাজী ছিল না, অনেক সাধাসাধি করে আনা হয়েছে।

রাধারানী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন?

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, তার প্রথম কারণ, ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হোক, এত টাকা সহজে কেউ দিতেও চায় না, ওকেও আসতে হয়না, এই ওর ফন্দি! দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।

কথাটা রাধারানী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল, তোমার গরজ ছাই। কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে দিলে কেন?

শুনবে?

হাঁ, বল।

সত্যেন্দ্র একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, ওর নাম বিজ্‌লী। এক সময়ে—কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়বে যে রানী, ঘরে যাবে?

যাব চল, বলিয়া রাধারানী উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া রাধারানী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, তাই আজ ওঁকে অপমান করে শোধ নেবে? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে?

এদিকে সত্যেন্দ্রর নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও ধরিয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। কেউ জানবেও না।

রাধারানী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে আসর ভরিয়া গিয়াছে এবং উপরের বারান্দায় বহু স্ত্রীকণ্ঠের সলজ্জ চীৎকার চিকের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নর্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজ্‌লী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে, যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু, সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে, পা এমন করিয়া দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টা-দুই পূর্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

আপনাকে ডাকচেন—। বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া দেখিল পাশে

দাঁড়াইয়া একটি বার-তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, মা আপনাকে ডাকচেন।

বিজ্‌লী বিশ্বাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কে আমাকে ডাকচেন?

মা ডাকচেন।

তুমি কে?

আমি বাড়ির চাকর।

বিজ্‌লী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞাসা করে এসো।

বালক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার নাম বিজ্‌লী ত? আপনাকেই ডাকচেন,—আসুন আমাব সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

চল বলিয়া বিজ্‌লী তাড়াতাড়ি পায়েব ঘুঙুব খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার অনুসবণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমায়েস আছে, তাই এই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাধারানী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ত্রস্ত কুণ্ঠিত পদে বিজ্‌লী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবা-মাত্রই সে সসম্ভ্রমে হাত ধবিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল; এবং একটা চৌকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, দিদি, চিনতে পার?

বিজ্‌লী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। রাধারানী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, ছোটবোনকে না হয় নাই চিনলে দিদি, সে দুঃখ করিনে; কিন্তু এটাকে না চিনতে পারলে সত্যিই ভারী ঝগড়া করব। বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজ্‌লী তথাপি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার আঁধার আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল।

সেই অনিন্দ্যসুন্দর মাতৃমুখ হইতে সদ্যবিকশিত গোলাপ-সদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাধারানী নিস্তব্ধ। বিজ্‌লী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধারানী কহিল, চিনেচ দিদি?

চিনেচি বোন।

রাধারানী কহিল, দিদি, সমুদ্র-মন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোটবোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই আমি তাঁকে পেয়েচি।

সত্যেন্দ্রের একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া বিজ্‌লী এক-দৃষ্টে দেখিতেছিল; মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, বিষের বিষই যে অমৃত বোন। আমি বঞ্চিত হইনি ভাই। সেই বিষই এই ঘোর পাপিষ্ঠাকে অমর করেচে।

রাধারানী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, দেখা করবে দিদি?

বিজ্‌লী একমুহূর্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যেদিন তিনি এই অস্পৃশ্যটাকে চিনতে পেরে, বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সেদিন দর্প করে বলেছিলুম, আবার দেখা হবে, আবার তুমি আসবে। কিন্তু, সেই দর্প আমার রইল না, আর তিনি এলেন না। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিলেন! তিনি ভেঙ্গে দিয়ে যে কি করে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে কথা আমার চেয়ে আজ কেউ জানে না বোন! বলিয়া সে আর একবার ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, প্রাণের জ্বালায় ভগবানকে নির্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেচেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সব-

দিকে মাটি হয়ে যেতুম ! তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেলতুম।

কান্নায় রাধারানীর গলা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। বিজ্‌লী পুনরায় কহিল, ভেবেছিলুম, কখনও দেখা হলে তাঁর পায়ে ধরে আর একটিবার মাপ চেয়ে দেখব। কিন্তু তার আর দরকার নেই। এই ছবিটুকু শুধু দাও দিদি—এর বেশী আমি চাইনে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য করবেন না—আমি চললুম, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারানী গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে দেখা হবে দিদি ?

দেখা আর হবে না বোন। আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেইটে বিক্রি করে যত শীঘ্র পারি চলে যাব। ভাল কথা, বলতে পার ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন ? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাকতে যায়, তখন কেন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল ?

লজ্জায় রাধারানীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিজ্‌লী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, হয়ত বুঝচি : আমাকে অপমান করবেন বলে, না ? তা ছাড়া, এত চেষ্টা করে আমাকে আনবার ত কোন কারণই দেখিনে।

রাধারানীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজ্‌লী হাসিয়া বলিল, তোমার লজ্জা কি বোন ? তবে তাঁরও ভুল হয়েচে। তাঁর পায়ে আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই ! অপমান করলে, সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।

নমস্কার দিদি !

নমস্কার বোন ! বয়সে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্বাদ করবার অধিকার ত আমার নেই—আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। চললুম।

হরিচরণ

"—" সে আজ অনেকদিনের কথা। প্রায় দশ-বারো বৎসরের কথা। তখন দুর্গাদাসবাবু উকিল হন নাই। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি বোধ হয় ভাল চেনো না, আমি বেশ চিনি। এসো তাঁহাকে আজ পরিচিত করিয়া দিই।

ছেলেবেলায় কোথা হইতে এক অনাথ পিতৃমাতৃহীন কায়স্থ বালক রামদাসবাবুর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সকলেই বলিত, ছেলেটি বড় ভাল! বেশ সুন্দর বুদ্ধিমান চাকর, দুর্গাদাসবাবুর পিতার বড় স্নেহের ভৃত্য।

সব কাজকর্মই সে নিজে টানিয়া লয়। গরুর জাব দেওয়া হইতে বাবুকে তেল মাখান পর্যন্ত সমস্তই সে নিজে করিতে চাহে। সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে বড় ভালবাসে।

ছেলেটির নাম হরিচরণ। গৃহিণী প্রায়ই হরিচরণের কাজকর্মে বিস্মিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও করিতেন, বলিতেন, হরি—অন্য অন্য চাকর আছে; তুই ছেলেমানুষ, এত খাটিস কেন? হরির দোষের মধ্যে ছিল সে বড় হাসিতে ভালবাসিত। হাসিয়া উত্তর করিত, মা আমরা গরীব লোক, চিরকাল খাটতেই হবে, আর বসে থেকেই বা কি হবে?

এইরূপ কাজকর্মে, সুখে, স্নেহের ক্রোড়ে হরিচরণের প্রায় এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল।

সুরো রামদাসবাবুর ছোট মেয়ে। সুরোর বয়স এখন প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর। হরিচরণের সহিত সুরোর বড় আত্মীয়ভাব দেখা

যাইত! যখন দুগ্ধ-পানের নিমিত্ত গৃহিণীর সহিত সুরো দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিত, যখন মা অনেক অযথা বচসা করিয়াও এই ক্ষুদ্র কন্যাটিকে স্বমতে আনিতে পারিতেন না এবং দুগ্ধ-পানের বিশেষ আবশ্যকতা ও তাহার অভাবে কন্যারত্নের আশু প্রাণবিয়োগের আশঙ্কায় শঙ্কান্বিত হইয়া বিষম ক্রোধে সুরবালার গণ্ডদ্বয়বিশেষ টিপিয়া ধরিয়াও তাহাকে দুধ খাওয়াইতে পারিতেন না, তখনও হরিচরণের কথায় অনেক ফল লাভ হইত।

যাক, অনেক বাজে কথা বকিয়া ফেলিলাম। আসল কথাটা এখন বলি, শোনো। না হয় সুরো হরিচরণকে ভালবাসিত।

দুর্গাদাসবাবুর যখন কুড়ি বৎসর বয়স, তখনকার কথাই বলিতেছি। দুর্গাদাস এতদিন কলিকাতাতেই পড়িত। বাড়ি আসিতে হইলে ষ্টিমারে দক্ষিণ দিকে যাইতে হইত তাহার পরেও প্রায় হাঁটা-পথে দশ-বারো ক্রোশ আসিতে হইত: সুতরাং পথটা বড় সহজগম্য ছিল না। এইজন্যই দুর্গাদাসবাবু বড় একটা বাড়ি যাইতেন না।

ছেলে বি. এ পাস হইয়া বাড়ি আসিয়াছে। মাতাঠাকুরানী অতিশয় ব্যস্ত। ছেলেকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে, দাওয়াইতে, যত্ন-আত্মীয়তা করিতে, যেন বাটীসুদ্ধ সকলেই একসঙ্গে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিল, মা, এ ছেলেটি কে গা? মা বলিলেন, এটি একজন কায়েতের ছেলে; বাপ-মা নেই, তাই কর্তা ওকে নিজে রেখেছেন। চাকরের কাজকর্ম সমস্তই করে, আর বড় শান্ত; কোন কথাতেই রাগ করে না। আহা! বাপ-মা নেই—তাতে ছেলে-মানুষ—আমি বড় ভালবাসি।

বাড়ি আসিয়া দুর্গাদাসবাবু হরিচরণের এই পরিচয় পাইলেন।

যাহা হোক, আজকাল হরিচরণের অনেক কাজ বাড়িয়া গিয়াছে।

সে তাহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট নহে। ছোটবাবুকে (দুর্গাদাসকে) স্নান করান, দরকার-মত জলের গাড়ু এক সময়ে পানের ডিবে, উপযুক্ত অবসরে হুঁকা ইত্যাদি যোগাড় করিয়া রাখিতে হরিচরণ বেশ পটু। দুর্গাদাসবাবুও প্রায় ভাবেন, ছেলেটি বেশ Intellgent. সুতরাং, কাপড় কোঁচান, তামাক সাজা প্রভৃতি কর্ম হরিচরণ না করিলে দুর্গাদাসবাবুর পছন্দ হয় না।

কিছু বুঝি না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় মনে আছে কি? একবার দুজনে কাঁদিতে কাঁদিতে পড়ি বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। আমার বোধ হয় সব কথাতেই এটা খাটে। দেখেছ কি ভাল থেকে কেবল ভালই দাঁড়ায়, মন্দ কি কখনও আসিয়া দাঁড়ায় না? যদি না দেখিয়া থাক তবে এসো, আজ তোমাকে দেখাই—বড়ই দুরূহ তত্ত্ব।

উপরি-উক্ত কথা-কয়টি সকলের বুঝিতে পারা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই, আর আমারও Philosophy নিয়ে deal করা উদ্দেশ্য নহে; তবুও আপসে দুটো কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি কি?

আজ দুর্গাদাসবাবুর একটা জাঁকাল ভোজের নিমন্ত্রণ আছে। বাড়িতে খাইবেন না, সম্ভবতঃ অনেক রাত্রে ফিরিবেন। এইসব কারণে হরিচরণকে প্রাত্যহিক কর্ম সারিয়া রাখিয়া শয়ন করিতে বলিয়া গেছেন।

এখন হরিচরণের কথা বলি। দুর্গাদাসবাবু বাহিরে বসিবার ঘরেই রাত্রে শয়ন করিতেন। তাহার কারণ অনেকেই অবগত নহে। আমার বোধ হয় গৃহিণী বাপের বাড়িতে থাকায়, বাহিরের ঘরে শয়ন করাই তাঁহার অধিক মনোনীত ছিল।

রাত্রে দুর্গাদাসবাবুর শয্যা রচনা করা, তিনি শয়ন করিলে তাঁহার পদসেবা ইত্যাদি কাজ হরিচরণের ছিল। পরে বাবুর রীতিমত নিদ্রাকর্ষণ হইলে হরিচরণ পাশের একটি ঘরে শুইতে যাইত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই হরিচরণের মাথা টিপটিপ করিতে লাগিল।

হরিচরণ বুঝিল, জ্বর আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই! মধ্যে মধ্যে তাহার প্রায়ই জ্বর হইত; সুতরাং এ-সব লক্ষণ তাহার বিশেষ জানা ছিল। হরিচরণ আর বসিতে পারিল না, ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোটবাবুর যে বিছানা প্রস্তুত হইল না, এ কথা আর মনে রহিল না। রাত্রে সকলেই আহারাদি করিল, কিন্তু হরিচরণ আসিল না! গৃহিণী দেখিতে আসিলেন। হরিচরণ ঘুমাইয়া আছে, গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন গা বড় গরম। বুঝিলেন, জ্বর হইয়াছে, সুতরাং আর বিরক্ত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। ভোজ শেষ করিয়া দুর্গাদাসবাবু বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, শয্যা প্রস্তুত হয় নাই। একে ঘুমের ঘোর, তাহাতে আবার সমস্ত পথ কি করিয়া বাড়ি যাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িবেন, আর হরিচরণ শ্রান্ত পদযুগলকে বিনামা হইতে বিমুক্ত করিয়া অল্প অল্প টিপিয়া দিতে থাকিবে এবং সেই সুখে অল্প তন্দ্রার ঝোঁকে গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া একেবারে প্রভাত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন।

একেবারে হতাশ হইয়া বিষম জ্বলিয়া উঠিলেন, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া দুই-চারিবার হরিচরণ, হরি, হরে—ইত্যাদি রবে চীৎকার করিলেন। কিন্তু কোথায় হরি? সে জ্বরের প্রকোপে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে। তখন দুর্গাদাসবাবু ভাবিলেন, বেটা ঘুমাইয়াছে; ঘরে গিয়া দেখিলেন, বেণ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

আর সহ্য হইল না। ভয়ানক জোরে হরির চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হরি ঢলিয়া বিছানার উপর পুনর্বার শুইয়া পড়িল। তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গাদাসবাবু হিতাহিত বিস্মৃত হইলেন। হরির পিঠে সবুট পদাঘাত করিলেন। সে ভীম প্রহারে চৈতন্যলাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কচি খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, বিছানাটা কি আমি করব? কথায় কথায়

রাগ আরও বাড়িয়া গেল; হস্তের বেত্র-যষ্টি আবার হরিচরণের পৃষ্ঠে বার দুই-তিন পড়িয়া গেল।

হরি রাত্রে যখন পদসেবা করিতেছিল, তখন এক ফোঁটা গরম জল বোধ হয় দুর্গাদাসবাবুর পায়ের উপর পড়িয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি দুর্গাদাসবাবুর নিদ্রা হয় নাই। এক ফোঁটা জল বড়ই গরম বোধ হইয়াছিল। দুর্গাদাসবাবু হরিচরণকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাহার নম্রতার জন্য সে দুর্গাদাসবাবুর কেন সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল। বিশেষ এই মাস-খানেকের ঘনিষ্ঠতায় সে আরও প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাত্রে কতবার দুর্গাদাসবাবুর মনে হইল যে, একবার দেখিয়া আসেন, কত লাগিয়াছে, কত ফুলিয়াছে। কিন্তু সে যে চাকর, তা ত ভাল দেখায় না। কতবার মনে হইল, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসেন, জ্বরটা কমিয়াছে কি না! কিন্তু তাহাতে যে লজ্জা বোধ হয়! সকালবেলায় হরিচরণ মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল, তামাক সাজিয়া দিল। দুর্গাদাসবাবু তখনও যদি বলিতেন, আহা! সে ত বালক মাত্র, তখনও ত তাহার ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। বালক বলিয়াও যদি একবার কাছে টানিয়া লইয়া দেখিতেন, তোমার বেতের আঘাতে কিরূপ রক্ত জমিয়া আছে, তোমার জুতোর কাঠিতে কিরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছে। বালককে আর লজ্জা কি?

বেলা নয়টার সময় কোথা হইতে একখানা টেলিগ্রাম আসিল। তারের সংবাদে দুর্গাদাসবাবুর মনটা কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। খুলিয়া দেখিলেন, স্ত্রীর বড় পাড়া। ধড়াস করিয়া বুকখানা এক হাত বসিয়া গেল। সেইদিনই তাঁহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। গাড়িতে উঠিয়া ভাবিলেন, ভগবান! বুঝি-বা প্রায়শ্চিত্ত হয়।

প্রায় মাস-খানেক হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাসবাবুর মুখখানি আজ

বড় প্রফুল্ল, তাঁহার স্ত্রী এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন। অন্ত পথ্য পাইয়াছেন।

বাড়ি হইতে আজ একখানা পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি দুর্গাদাস-বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার লিখিত। তলায় একস্থানে 'পুনশ্চ' বলিয়া লিখিত রহিয়াছে—বড় দুঃখের কথা, কাল সকালবেলা দশ দিনের জ্বরবিকারে আমাদের হরিচরণ মরিয়া গিয়াছে। মরিবার আগে সে অনেকবার আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিল।

আহা! মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ!

ধীরে ধীরে দুর্গাদাসবাবু পত্রখানা শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

ভালমন্দ

অবিনাশ ঘোষাল আরও বছর-কয়েক চাকরি করতে পারতেন কিন্তু তা সম্ভব হোলো না। খবর এলো এবারেও তাঁকে ডিঙিয়ে কে একজন জুনিয়ার মুনসেফ সব-জজ হয়ে গেল। অন্যান্য বারের মতো এবারেও অবিনাশ নীরব হয়ে রইলেন, শুধু প্রভেদ রইলো এই যে, এবারে তিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট সমেত অবসর গ্রহণের আবেদন যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। আবেদন মঞ্জুর হবেই এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

অবিনাশ সুজন, সুবিচারক, কাজের ক্ষিপ্রতায় সকলেই খুশী, ভদ্র আচরণের প্রশংসা সবাই করে, তবু এই দুর্গতি! এর পিছনে যে গোপন ইতিহাসটুকু আছে কম লোকেই তা জানে। সেটা বলি। তাঁর চাকরির গোড়ার দিকে, একবার এক ছোকরা ইংরেজ আই. সি. এস. জেলার জজ হয়ে আসেন অফিস ইন্‌সপেকসনে। সামান্য ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে প্রথমে ঘটলো মতভেদ, পরে পরিণত হলো সেটা বিষম বিবাদে। ফিরে গিয়ে জজসাহেব নিরন্তর ব্যাপৃত রইলেন তাঁর কাজের ছিদ্রান্বেষণে, কিন্তু ছিদ্র পাওয়া সহজ ছিল না। জজসাহেবের মন তাতে কিছুমাত্র প্রসন্ন হলো না। রায় কেটেও দেখলেন হাইকোর্টে সেটা টেঁকে না—নিজেকেই অপ্রতিভ হতে হয় বেশী। বদলির সময় হয়েছিল, অবিনাশ চলে গেলেন অন্য জেলায়, কিন্তু দেখা করে গেলেন না। শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রচলিত রীতিতে তাঁর দারুণ ত্রুটি ঘটলো। তারপরে কত বছর কেটে গেল, ব্যাপারটা অবিনাশ ভুলেছিলেন কিন্তু তিনি ভোলেন নি। তারই প্রমাণ এলো কিছুকাল পূর্বে। সেই ছোকরা জজ হয়ে এসেছেন এখন হাইকোর্টে,

মুনসেফ প্রভৃতির দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে। অবিনাশ সিনিয়র লোক কাজে সুনাম যথেষ্ট, উন্নতির পথ সম্পূর্ণ বাধাহীন, হঠাৎ দেখা গেল, তাঁকে ডিঙিয়ে নীচের লোক হয়ে গেল সব-জজ। আবার এখানেই শেষ নয়, পরে পরে আরও তিনজন তাঁকে এমনি অতিক্রম করে উপরে উঠে গেল। যাঁরা জানেন না তাঁরা বলবেন, এ কি কখনো হয়? এ যে গবর্নমেণ্টের চাকরি! তায় আবার এত বড় চাকরি! এ কি কাজীর আমল! কিন্তু অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা বলবেন, হয়। এবং আরও বেশী কিছু হয়। সুতরাং, অবিনাশ মনে মনে বুঝলেন এর থেকে আর উদ্ধার নেই। আত্মসম্মান ও চাকরি দু' নৌকোয় পা দিয়ে পাড়ি দেওয়া যায় না—যে কোন একটা বেছে নিতে হয়। সেইটেই এবার তিনি বেছে নিলেন।

বাসায় অবিনাশের ভার্যা আলোকলতা, আই. এ. ফেল-করা পুত্র হিমাংশু এবং কন্যা শাশ্বতী। ঝি-চাকরের সংখ্যা অফুরন্ত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না—এত বেশি।

সেদিন অবিনাশ আদালত থেকে ফিরলেন হাসিমুখে। যথারীতি বেশভূষা ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে জলযোগে বসে বললেন, যাক, এতদিনে মুক্তি পাওয়া গেল ছোটবৌ। সরকারীভাবে খবর না এলেও হাইকোর্টের এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ টেলিগ্রাম পেলাম আমার জেলখানার মিয়াদ ফুরলো বলে। অধিক বিলম্ব হবে না। বিলম্ব যে হবে না তা নিজেই জানতাম।

আলোকলতা অনতিদূরে একটা চেয়ারে বসে সেলাই করছিলেন, এবং কন্যা শাশ্বতী পিতার পাশে বসে তাঁকে বাতাস করছিল, শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন।

স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, এ কথার মানেটা কি?

অবিনাশ বললেন, শুনেছ বোধ হয় কে একজন গোবিন্দপদবাবু

এবারেও আমাকে ডিঙিয়ে মাস-ছয়েকের জন্যে সব-জজ হয়ে গেলেন। হগসাহেব হাইকোর্টে আসা পর্যন্ত বছর-তিনেক ধরে এই ব্যাপারই চলচে—একটা কথাও বলিনি। ভেবেছিলাম ওদের অন্যায়টা একদিন ওরা নিজেরাই বুঝবে, কিন্তু দেখলাম সে হবার নয়। অন্ততঃ ও লোকটি থাকতে নয়। অবিচার এতদিন সয়েছিলাম, কিন্তু আর সইলে মনুষ্যত্ব যাবে।

কাল বিকেলেই সদরআলার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে এমনি ধরনের একটা কথা আলোকলতা আভাসে-ইঙ্গিতে শুনে এসেছিলেন কিন্তু অর্থ তার বুঝতে পারেন নি। এখনো পারলেন না, শুধু বললেন, তদবির-তাগাদা না করলে আজকালকার দিনে কোন্ কাজটা হয়? মানুষ্যত্ব যাতে না যায় তার কি করেছ শুনি?

অবিনাশ বললেন, তদবির-তাগাদা পারিনে, কিন্তু যেটা পারি সেটা করেছি বৈ কি।

আলোকলতা স্বামীর মুখের পানে চেয়ে এখনও তাৎপর্য ধরতে পারলেন না, কিন্তু ভয় পেলেন। বললেন, সেটা কি শুনি না? কি করেছ বলো না?

অবিনাশ বললেন, সেটা হচ্ছে কাজে ইস্তফা দেওয়া—তা দিয়েছি।

আলোকের হাত থেকে সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেল। বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে বললেন, বলো কি গো? এতগুলো লোককে না খেতে দিয়ে উপোস করিয়ে মারবার সঙ্কল্প করেছ? কাজ ছাড়ো দিকি—আমি তোমার দিব্যি করে বলচি সেই দিনই গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

অবিনাশ স্থির হয়ে রইলেন, জবাব দিলেন না।

দরখাস্ত যদি দিয়ে থাকো, কালই উইথড্র করবে বলো?

না।

না কেন ? মনের দুঃখে ঝোঁকের মাথায় কত লোকেই ত কত কি করে ফেলে, তার কি প্রতিকার নেই ?

অবিনাশ আস্তে আস্তে বললেন, ঝোঁকের মাথায় ত আমি করিনি ছোটবৌ। যা করেছি ভেবে-চিন্তেই করেছি।

উইথড্র করবে না ?

না।

আমার মরণটাই তাহলে তুমি ইচ্ছে করো ?

তুমি ত জানো ছোটবৌ সে ইচ্ছে করিনে। তবু স্ত্রী হয়ে যদি স্বামীর মর্যাদা এমন করে নষ্ট করে দাও যে মানুষের কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে—

কথাটা অবিনাশের মুখে বেধে গেল—শেষ হলো না। আলোকলতা বললেন, কি তাহলে—বলো ?

উত্তরে একটা কঠোর কথা তাঁর মুখে এসেছিল, কিন্তু এবারেও বলা হোলো না। বাধা পড়লো কন্যার পক্ষ থেকে। এতক্ষণ সে নিঃশব্দেই সমস্ত শুনছিল, কিন্তু আর থাকতে পারলে না। বললে, না বাবা, এ সময়ে মার ভেবে দেখবার শক্তি নেই, তাঁকে কোন জবাব তুমি দিতে পারবে না।

মা মেয়ের স্পর্ধায় প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, পরক্ষণে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, শাশ্বতী, যা এখান থেকে, উঠে যা বলচি।

মেয়ে বললে, যদি উঠে যেতে হয়, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো মা। তোমার কাছে ফেলে রেখে যাবো না।

কি বললি ?

বললাম, তোমার কাছে ওঁকে একলা রেখে আমি যাবো না। কিছুতেই যাবো না। চলো বাবা, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি গে। সন্ধ্যের পরে আমি নিজে তোমার খাবার তৈরী করে

দেবো—এখন থাক গে খাওয়া। ওঠো বাবা, চলো। এই বলে সে তাঁর হাত ধরে একেবারে দাঁড় করিয়ে দিলে।

ওরা সত্যি চলে যায় দেখে আলোক নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, একটু দাঁড়াও। সত্যিই কি একবারও ভাবোনি, চাকরি ছেড়ে দিলে তোমার বাড়ির এতগুলি প্রাণী খাবে কি!

অবিনাশ উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু এবারেও বাধা এলো মেয়ের দিক থেকে। সে বললে, খাবার জন্যে কি সত্যিই তোমার ভয় হয়েছে মা? কিন্তু হবার ত কথা নয়। চাকরি ছাড়লেও বাবা পেনশন পাবেন—সে তিন শ' টাকার কম হবে না। পাশের বাড়ির সঞ্জীববাবু ষাট টাকা মাইনে পান, খেতে তাঁর ন-দশ জন। কতদিন দেখে এসেছি, খাওয়া তাঁদের আমাদের চেয়ে মন্দ নয়। তাঁদের চলে যাচ্ছে, আর আমাদের তিন-চারজনের খাওয়া-পরা চলবে না!

মায়ের আর ধৈর্য রইলো না, একটা বিশ্রী কটূক্তি করে চেঁচিয়ে উঠলেন—যা দূর হ আমার সুমুখ থেকে। তোর নিজের সংসার হলে গিন্নীপনা করিস, কিন্তু আমার সংসারে কথা কইলে বাড়ি থেকে বার করে দেবো।

মেয়ে একটু হেসে বললে, বেশ ত মা, তাই দাও। বাবার হাত ধরে আমি চলে যাই, তুমি আর দাদা বাবার সমস্ত পেনশন নিয়ে যা ইচ্ছে করো, আমরা কেউ কথা কব না। আমি যে-কোন মেয়ে ইস্কুলে চাকরি করে আমার বুড়ো বাপকে খাওয়াতে পারবো।

মা আর কথা কইলেন না, দেখতে দেখতে তাঁর দু চোখ উপচে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়লো।

মেয়ে বাপের হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে, বাবা, চলো না যাই। সন্ধ্যে হয়ে যাবে। অবিনাশ পা বাড়াতেই আলোকলতা আঁচলে

চোখ মুছে ধরা-গলায় বললেন, আর একটু দাঁড়াও। তোমার এ কি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা? এর নড়চর কি নেই?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললেন, না। সে হবার জো নেই।

দেখো, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী—

অবিনাশ বাধা দিলেন, বললেন, তা যদি সত্যি হয় ত আমার সুখের ভাগ এতদিন পেয়েছ, এবার আমার দুঃখের ভাগ নাও।

আলোক বললেন, রাজী আছি কিন্তু সমস্ত মান-ইজ্জত বজায় রেখে এতগুলো টাকায় চলে না, এই সামান্য ক'টা পেনশনের টাকায় চালাবো কি করে?

অবিনাশ বললেন, মান-ইজ্জত বলতে যদি বড়মানুষি বুঝে থাকো ত চলবে না আমি স্বীকার করি। নইলে সঞ্জীববাবুরও চলে।

কিন্তু তোমার মেয়ে? উনিশ-কুড়ি বছরের হলো, তার বিয়ে দেবে কি করে?

মেয়ের সমস্যার সমাধান করতে শাশ্বতী বললে, মা, আমার বিয়ের জন্যে তুমি ভেবো না। যদি নিতান্তই ভাবতে চাও ত বরঞ্চ ভেবো সঞ্জীববাবু কি করে তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর শুনে মায়ের আর একবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। সজল চক্ষু দৃপ্ত হলো, ধরা-গলা মুহূর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে কণ্ঠস্বর গেল উঁচু পর্দায় চড়ে। বললেন, শাশ্বতী, পোড়ারমুখী, আমার সুমুখ থেকে এখনো তুই দূর হয়ে গেলি নে কেন? যা যা বলছি।

যাচ্ছি মা। চলো না বাবা।

পাশের ঘরে হিমাংশু কবিতা রচনায় রত ছিল। আই. এ. পরীক্ষার তৃতীয় উদ্যমের এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। তার কবিতা 'বাতায়ন' পত্রিকায় ছাপা হয়, আর কোন কাগজওয়ালা নেয় না। 'বাতায়ন'-সম্পাদক উৎসাহ দিয়ে চিঠি লেখেন, "হিমাংশুবাবু,

আপনার কবিতাটি চমৎকার হয়েছে। আগামীবারে আর একটা পাঠাবেন—একটু ছোট করে। এবং ঐ সঙ্গে শাশ্বতী দেবীর একটি রচনা অতি অবশ্য পাঠাবেন।" জানিনে, 'বাতায়ন'-সম্পাদক সত্যি বলেন, না ঠাট্টা করেন। কিংবা তাঁর আর কোন উদ্দেশ্য আছে। শাশ্বতী দেখে হাসে—বলে, দাদা, এ চিঠি বন্ধু-মহলে আর দেখিয়ে বেড়িও না।

কেন বলতো?

না, এমনি বলচি। নিজের প্রশংসা নিজের হাতে প্রচার করে বেড়ানো কি ভালো?

কবিতা পাঠানোর আগে সে বোনকে পড়ানোর ছলে ভুল-চুকগুলো সব শুধরে নেয়। সংশোধনের মাত্রা কিছু বেশি হয়ে পড়লে লজ্জিত হয়ে বলে, তোর মত আমি ত আর বাবার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য পড়িনি, আমার দোষ কি? কিন্তু জানিস শাশ্বতী, আসলে এ কিছুই নয়। দশ টাকা মাইনে দিয়ে একটা পণ্ডিত রাখলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু কবিতার সত্যিকার প্রাণ হলো কল্পনায়, আইডিয়ায়, তার প্রকাশ-ভঙ্গিতে। সেখানে তোর কপাল মুগ্ধবোধের বাপের সাধ্যি নেই যে দাঁত ফোটায়।

সে সত্যি দাদা।

হিমাংশুর কলমের ডগায় একটি চমৎকার মিল এসে পড়েছিল, কিন্তু মায়ের তীব্রকণ্ঠ হঠাৎ সমস্ত ছত্রভঙ্গ করে দিল। কমল রেখে পাশের দোর ঠেলে সে এ ঘরে ঢুকতেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, জানিস হিমাংশু, আমাদের কি সর্বনাশ হলো? উনি চাকরি ছেড়ে দিলেন,—নইলে মনুষ্যত্ব চলে যাচ্ছিল। কেন? কেননা কোথাকার কে একজন ওঁর বদলে সব-জজ হয়েছে, উনি নিজে হতে পারেন নি। আমি স্পষ্ট বলচি, এ হিংসে ছাড়া আর কিছু নয়। নিছক হিংসে!

হিমাংশু চোখ কপালে তুলে বললে, তুমি বলো কি মা! চাকরি ছেড়ে দিলেন? হোয়াট্ ননসেন্স!

অবিনাশের মুখ পাংশু হয়ে গেল, তিনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে স্থির হয়ে রইলেন। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় তাঁর সমস্ত চেহারাটা যেন কি একপ্রকার অদ্ভুত দেখালো।

শাশ্বতী পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলো—উঃ—জগতে ধৃষ্টতার কি সীমা নেই বাবা! তুমি চলো এখান থেকে, নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো। বলে, অর্ধ-সচেতন বাপকে সে জোর করে টেনে নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেল।

সমাজ-ধর্মের মূল্য

বিড়ালকে মার্জার বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস করায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ যদি বা পায়, তথাপি পণ্ডিতের কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে লোকের যে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। জানি বলিয়াই, প্রবন্ধ লেখার প্রচলিত পদ্ধতি যাই হউক, প্রথমেই 'সমাজ' কথাটা বুঝাইবার জন্য ইহার ব্যুৎপত্তিগত এবং উৎপত্তিগত ইতিহাস বিবৃত করিয়া, বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া, অবশেষে ইহা এ নয়, ও নয়, তা নয়—বলিয়া পাঠকের চিত্ত বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া গবেষণাপূর্ণ উপসংহার করিতে আমি নারাজ। আমি জানি, এ প্রবন্ধ পড়িতে যাঁহার ধৈর্য থাকিবে, তাঁহাকে 'সমাজের' মানে বুঝাইতে হইবে না। দলবদ্ধ হইয়া বাস করার নামই যে সমাজ নয়—নৌরোলা মাছের ঝাঁক, মৌমাছির চাক, পিঁপড়ার বাসা বা বীর হনুমানের মস্ত দলটাকে যে 'সমাজ' বলে না, এ খবর আমার নিকট হইতে এই তিনি নূতন শুনিবেন না।

তবে, কেহ যদি বলেন, 'সমাজ' সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ঝাপসা গোছের ধারণা মানুষের থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা কি প্রবন্ধকারের উচিত নয়? তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, না। কারণ সংসারে অনেক বস্তু আছে, যাহার মোটামুটি ঝাপসা ধারণাটাই সত্য বস্তু,—সূক্ষ্ম করিয়া দেখাইতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, ফাঁকি দেওয়া! 'ঈশ্বর' বলিলে যে ধারণাটা মানুষের হয়, সেটা অত্যন্তই মোটা, কিন্তু সেইটাই কাজের জিনিস। এই মোটার উপরেই দুনিয়া চলে, সূক্ষ্মের উপর নয়। সমাজও ঠিক তাই। একজন অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের চাষা

'সমাজ' বলিয়া যাহাকে জানে, তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে—পণ্ডিতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপরে চলে না। অন্ততঃ আমি বোঝাপড়া করিতে চাই এই মোটা বস্তুটিকে লইয়াই। যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়; বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে; কাজকর্মে, হাতে-পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়, উৎসবে-ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে; যে সহস্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি এবং এই সমাজ যদ্দ্বারা শাসিত হয়, সেই বস্তুটিকেই সমাজ-ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছি। তবে, এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের, সকল জাতির সমাজকে শাসন করে, সেই সামাজিক ধর্মের আলোচনা করা আমার প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কারণ, মানুষ মোটের উপর মানুষই। তাহার সুখ-দুঃখ আচার ব্যবহারেব ধারা সর্বদেশেই একদিকে চলে। মড়া মরিলে সব দেশেই প্রতিবেশীরা সৎকার করিতে জড় হয়; বিবাহে সর্বত্রই আনন্দ করিতে আসে; বাপ-মা সব দেশেই সন্তানের পূজ্য; বয়োবৃদ্ধের সম্মাননা সব দেশেরই নিয়ম; স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ প্রায়ই একরূপ; আতিথ্য সর্বদেশেই গৃহস্থের ধর্ম। প্রভেদ শুধু খুঁটিনাটিতে। মৃতদেহ কেহ-বা গৃহ হইতে গাড়ি-পালকি করিয়া, ফুলের মালায় আবৃত করিয়া গোরস্থানে লইয়া যায়, কেহ-বা ছেঁড়া মাদুরে জড়াইয়া, বংশখণ্ডে বিচালির দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, গোবরজলের সৌগন্ধ ছড়াইয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে লইয়া চলে; বিবাহ করিতে কোথাও-বা বরকে তরবারি প্রভৃতি পাঁচ হাতিয়ার বাঁধিয়া যাইতে হয়, আর কোথাও জাঁতিটি হাতে করিয়া গেলেই পাঁচ হাতিয়ারের কাজ হইতেছে মনে করা হয়। বস্তুতঃ এইসব ছোট জিনিস লইয়াই মানুষে মানুষে বাদ-বিতণ্ডা কলহ-বিবাদ। এবং যাহা বড়, প্রশস্ত, সমাজে বাস করিবার পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ

নাই, হইতেও পারে না। আর পারে না বলিয়াই এখনও ভগবানের রাজ্য বজায় রহিয়াছে ; মানুষ সংসারে আজীবন বাস করিয়া জীবনান্তে তাঁহারই পদাশ্রয়ে পৌঁছিবার ভরসা করিতেছে। অতএব মৃতদেহের সৎকার করিতে হয়, বিবাহ করিয়া সন্তান প্রতিপালন করিতে হয়, প্রতিবেশীকে সুবিধা পাইলেই খুন করিতে নাই, চুরি করা পাপ, এইসব স্থূল, অথচ, অত্যাবশ্যক সামাজিক ধর্ম সবাই মানিতে বাধ্য ; তা তাহার বাড়ি আফ্রিকার সাহারাতেই হউক, আর এশিয়ার সাইবিরিয়াতেই হউক। কিন্তু এই সকল আমার প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। অথচ, এমন কথাও বলি নাই, মনেও করি না যে, যাহা কিছু ছোট, তাহাই তুচ্ছ এবং আলোচনার অযোগ্য। পৃথিবীর যাবতীয় সমাজের সম্পর্কে ইহারা কাজে না আসিলেও বিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ সমাজের মধ্যে ইহাদের যথেষ্ট কাজ আছে এবং সে কাজ তুচ্ছ নহে। সকল ক্ষেত্রেই এই সকল কর্মসমষ্টি—যা দেশাচাররূপে প্রকাশ পায়—তাহার যে অর্থ আছে, কিংবা সে অর্থ সুস্পষ্ট, তাহাও নহে ; কিন্তু ইহারাই যে বিভিন্ন স্থানে সার্বজনীন সামাজিক ধর্মের বাহক, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। বহন করিবার এই সকল বিচিত্র ধারাগুলিকে চোখ মেলিয়া দেখাই আমার লক্ষ্য।

সামাজিক মানুষকে তিন প্রকার শাসন-পাশ আজীবন বহন করিতে হয়। প্রথম রাজ-শাসন, দ্বিতীয় নৈতিক-শাসন এবং তৃতীয় যাহাকে দেশাচার কহে, তাহারই শাসন।

রাজ-শাসন ; আমি স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত রাজার কথা বলিতেছি না—যে রাজা সুসভ্য, প্রজাবৎসল—তাঁহার শাসনের মধ্যে তাঁহার প্রজাবৃন্দেরই সমবেত ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাই খুন করিয়া যখন সেই শাসন-পাশ গলায় বাঁধিয়া ফাঁসিকাঠে গিয়া উঠি, তখন সে ফাঁসের মধ্যে আমার নিজের ইচ্ছা যে প্রকারান্তরে মিশিয়া নাই, এ কথা বলা যায় না। অথচ মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে আমার নিজের বেলা

সেই নিজের ইচ্ছাকে যখন ফাঁকি দিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাই, তখন সে আসিয়া জোর করে, সে-ই রাজশক্তি। শক্তি ব্যতীত শাসন হয় না। এমনি নীতি এবং দেশাচারকে মান্য করিতে যে আমাকে বাধ্য করে, সে-ই আমার সমাজ এবং সামাজিক আইন।

আইনের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা প্রকার মতামত প্রচলিত থাকিলেও মুখ্যতঃ রাজার সৃজিত আইন যেমন রাজা-প্রজা উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে, নীতি ও দেশাচার তেমনি সমাজ-সৃষ্ট হইয়াও সমাজ ও সামাজিক মনুষ্য উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু, এই আইনগুলি কি নির্ভুল? কেহই ত এমন কথা কহে না। ইহার মধ্যে কত অসম্পূর্ণতা কত অন্যায়, কত অসঙ্গতি ও কঠোরতার শৃঙ্খল রহিয়াছে। নাই কোথায়? রাজার আইনের মধ্যেও আছে, সমাজের আইনের মধ্যেও রহিয়াছে।

এত থাকা সত্ত্বেও, আইন-সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার করিয়া যত লোক যত কথা বলিয়া গিয়াছেন—যদিচ আমি তাঁহাদের মতামত তুলিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না—মোটের উপর তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন, আইন, যতক্ষণ আইন —তা ভুলভ্রান্তি তাহাতে যতই কেন থাকুক না, ততক্ষণ—শিরোধার্য তাহাকে করিতেই হইবে। না করার নাম বিদ্রোহ। এবং "The righteousness of a cause is never alone a sufficient justification of rebellion."

সামাজিক আইন-কানুন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে না কি?

আমি আমাদের সমাজের কথাই বলি। রাজার আইন রাজা দেখিবেন, সে আমার বক্তব্য নয়। কিন্তু সামাজিক আইন-কানুনে—ভুলচুক অন্যায়-অসঙ্গতি কি আছে না-আছে, সে না হয় পরে দেখা যাইবে,—কিন্তু এই সকল থাকা সত্ত্বেও ত ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসন-বিধি, ততক্ষণ ত শুধু নিজের

ন্যায্য দাবীর অছিলায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া তোলা যায় না। সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি, ভুলভ্রান্তি বিচার করিয়া সংশোধন করা যায়, কিন্তু তাহা না করিয়া শুধু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বলে একা একা বা দুই চারিজন সঙ্গী লইয়া বিপ্লব বাধাইয়া দিয়া সে সমাজ-সংস্কারের সুফল পাওয়া যায়, তাহা ত কোনমতেই বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত রবিবাবুর 'গোরা' বইখানি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই প্রকারের কিছু কিছু আলোচনা তাহাতে আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার কি মীমাংসা করা হইয়াছে আমি জানি না। তবে, ন্যায়-পক্ষ হইলে এবং উদ্দেশ্য সাধু হইলে যেন দোষ নেই, এই রকম মনে হয়। সত্যপ্রিয় পরেশবাবু সত্যকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিপ্লবের সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। 'সত্য' কথাটি শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার ঠিক চেহারাটি চিনিয়া বাহির করা কঠিন। কারণ, কোন পক্ষই মনে করে না যে, সে অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। উভয় পক্ষেরই ধারণা—সত্য তাহারই দিকে।

ইহাতে আরও একটি কথা বলা হইয়াছে যে, সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হাত দিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজের জন্য সঙ্কুচিত হইতে পারে না। বরঞ্চ, সমাজকেই এই স্বাধীনতার স্থান যোগাইবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করিতে হইবে। পণ্ডিত H. Spencer-এর মতও তাই। তবে, তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়াছে যে, যতক্ষণ না তাহা অপরের তুল্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু, ভাল করিয়া দেখিতে গেলে, এই অপরের তুল্য স্বাধীনতায় যে কার্যক্ষেত্রে কতদিকে কতপ্রকারে টান ধরে, পরিশেষে ঐ 'সত্য' কথাটির মত কোথায় যে 'সত্য' আছে—তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, কথাটা মিথ্যা নয় যে, সামাজিক আইন বা রাজার আইন চিরদিন এমনি করিয়াই প্রসারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু

যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ সমাজ যদি তাহার শাস্ত্র বা অন্যায় দেশাচারে কাহাকেও ক্লেশ দিতেই বাধ্য হয়, তাহার সংশোধন না করা পর্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবী বা স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে যে কোন মঙ্গল হয় না, এমন কথাও ত জোর করিয়া বলা চলে না।

কথাটা শুনিতে হয়ত কতকটা হেঁয়ালির মত হইল। পরে তাহাকে পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিব। কিন্তু এইখানে একটা মোটা কথা বলিয়া রাখি যে, রাজশক্তির বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়া তাহার বল ক্ষয় করিয়া তোলায় যেমন দেশের মঙ্গল নাই—একটা ভালর জন্য অনেক ভাল তাহাতে যেমন বিপর্যস্ত, লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, সমাজ-শক্তির সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। এই কথাটা কোনমতেই ভোলা চলে না যে, প্রতিবাদ এক বস্তু, কিন্তু বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বিদ্রোহকে চরম প্রতিবাদ বলিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। কারণ, ইহা অনেক-বার অনেক প্রকারে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিষ্ঠিত শাসন-দণ্ডের উচ্ছেদ করিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ শাসন-দণ্ড প্রবর্তিত করিলেও কোন ফল হয় না, বরঞ্চ কুফলই ফলে।

আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে এই কথাটা অনেকটা বোঝা যায়। সেই সময়ের বাংলা দেশের সহস্র প্রকার অসঙ্গত, অমূলক ও অবোধ্য দেশাচারে বিরক্ত হইয়া কয়েকজন মহৎপ্রাণ মহাত্মা এই অন্যায়রাশির আমূল সংস্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত করিয়া নিজেদের এরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন যে, তাহা নিজেদের যদি বা কাজে লাগিয়া থাকে, দেশের কোন কাজেই লাগিল না। দেশ তাঁহাদের বিদ্রোহী ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান মনে করিতে লাগিল। তাঁহারা জাতিভেদ তুলিয়া দিলেন, আহারের আচার-বিচার মানিলেন না, সপ্তাহ অন্তে একদিন গির্জার মত সমাজগৃহে বা মন্দিরের মধ্যে জুতা-

মোজা পায়ে দিয়া ভিড় করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা এত বেশী সংস্কার করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাদের সমস্ত কার্যকলাপই তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত আচার-বিচারের সহিত একেবারে উলটা বলিয়া লোকের চক্ষে পড়িতে লাগিল। ইহা যে হিন্দুর পরম সম্পদ বেদমূলক ধর্ম, সে কথা কেহই বুঝিতে চাহিল না। আজও পাড়াগাঁয়ে লোক ব্রাহ্মদের খ্রীষ্টান বলিয়াই মনে করে।

কিন্তু যে-সকল সংস্কার তাঁহারা প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, দেশের লোক যদি তাহা নিজেদেরই দেশের জিনিস বলিয়া বুঝিতে পারিত এবং গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আজ বাঙালী সমাজের এ দুর্দশা বোধ করি থাকিত না। অসীম দুঃখময় এই বিবাহ-সমস্যা, বিধবার সমস্যা, উন্নতিমূলক বিলাত-যাওয়া-সমস্যা, সমস্তই একসঙ্গে একটা নির্দিষ্ট কূলে আসিয়া পৌঁছিতে পারিত। অন্যপক্ষে গতি এবং বৃদ্ধিই যদি সজীবতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই ব্রাহ্ম-সমাজও আজ মৃত্যুমুখে পতিত না হইলেও অকাল-বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছে।

সংস্কার মানেই প্রতিষ্ঠিতের সহিত বিরোধ; এবং অত্যন্ত সংস্কারের চেষ্টাই চরম বিরোধ বা বিদ্রোহ। ব্রাহ্ম-সমাজ এ কথা বিস্মৃত হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-বিচার সম্বন্ধে নিজেদের এতটাই স্বতন্ত্র এবং উন্নত করিয়া ফেলিলেন যে, হিন্দু-সমাজ হঠাৎ তীব্র ক্রোধ ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং নিজেদের অবসরকালে ইহাদিগকে লইয়া এখানে ওখানে বেশ একটু আমোদ করিতেও লাগিল।

হায় রে! এমন ধর্ম, এমন সমাজ, পরিশেষে কিনা পরিহাসের বস্তু হইয়া উঠিল। জানি না, এই পরিহাসের জরিমানা কোনদিন হিন্দুকে সুদ-সুদ্ধ উসুল দিতে হইবে কি না। কিন্তু ব্রাহ্মই বল, আর হিন্দুই বল, বাংলার বাঙালী-সমাজে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল দুই দিক দিয়াই।

আরও একটা কথা এই যে, সামাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হয় যে দিক দিয়া, তাহার সংস্কারও হওয়া চাই সেই দিক দিয়া ; শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন যাঁহারা, সংস্কার করিবেন তাঁহারাই। অর্থাৎ, মনু-পরাশরের বিধিনিষেধ মনু-পরাশরের দিক দিয়াই সংস্কৃত হওয়া চাই। বাইবেল কোরান হাজার ভাল হইলেও কোন কাজেই আসিবে না। দেশের ব্রাহ্মণেরাই যদি সমাজ-যন্ত্র এতাবৎকাল পরিচালন করিয়া আসিয়া থাকেন, ইহার মেরামতি-কার্য তাঁহাদিগকে দিয়াই করাইয়া লইতে হইবে। এখানে হাইকোর্টের জজেরা হাজার বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না। দেশের লোক এ-বিষয়ে পুরুষানুক্রমে যাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে অভ্যাস করিয়াছে—হাজার বদ-অভ্যাস হইলেও সে অভ্যাস তাহারা ছাড়িতে চাহিবে না।

এ-সকল স্থূল সত্য কথা। সুতরাং আশা করি, এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে বিশেষ কাহারো মতভেদ হইবে না।

যদি না হয়, তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মনু-পরাশরের হাত দিয়াই যদি হিন্দুর অবনতি পৌঁছিয়া থাকে ত উন্নতিও তাঁহাদের হাত দিয়াই পাইতে হইবে—অন্য কোন জাতির সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, তা সে যত উন্নতই হউক, হিন্দুকে কিছুই দিতে পারিবে না। তুলনায় সমালোচনায় দোষগুণ কিছু দেখাইয়া দিতে পারে, এইমাত্র।

কিন্তু যে-কোন বিধি-ব্যবস্থা হউক, যাহা মানুষকে শাসন করে, তাহার দোষগুণ কি দিয়া বিচার করা যায়? তাহার সুখ-সৌভাগ্য দিবার ক্ষমতা দিয়া, কিংবা তাহার বিপদ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা দিয়া? Sir William Markly তাঁহার Elements of Law গ্রন্থে বলেন—"The value is to be measured not by the happiness which it procures, but by the misery from which it preserves us." আমিও ইহাই বিশ্বাস করি। সুতরাং মনু-পরাশরের বিধি-ব্যবস্থা

আমাদের কি সম্পদ দান করিয়াছে, সে তর্ক তুলিয়া নয়, কি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, শুধু সেই আলোচনা করিয়া সমাজের দোষগুণ বিচার করা উচিত। অতএব, আজও যদি আমাদের ঐ মনু-পরাশরের সংস্কার করাই আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে ঐ ধারা ধরিয়াই করা চাই। স্বর্গই হউক আর মোক্ষই হউক, সে কি দিতেছে, সে বিচার করিয়া নয়, বরঞ্চ সব বিপদ হইতে আজ আর সে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, শুধু সেই বিচার করিয়া। সুতরাং, হিন্দু যখন উপর দিকে চাহিয়া বলেন, ঐ দেখ আমাদের ধর্মশাস্ত্র স্বর্গের কবাট সোজা খুলিয়া দিয়াছেন, আমি তখন বলি—সেটা না হয় পরে দেখিয়ো, কিন্তু আপাততঃ নীচের দিকে চাহিয়া দেখ, নরকে পড়িবার দুয়ারটা সম্প্রতি বন্ধ করা হইয়াছে কি না। কারণ, এটা ওটার চেয়েও আবশ্যক। সহস্র বর্ষ পূর্বে হিন্দুশাস্ত্র স্বর্গপ্রবেশের যে সোজা পথটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে পথটি আজও নিশ্চয় তেমনই আছে! সেখানে পৌঁছিয়া একদিন সেইরূপ আমোদ উপভোগ করিবার আশা বেশী কথা নয়—কিন্তু, নানাপ্রকার বিজাতীয় সভ্যতা অসভ্যতার সংঘর্ষে ইতিমধ্যে নীচে পড়িয়া পিষিয়া মরিবার যে নিত্য নূতন পথ খুলিয়া যাইতেছে, সেগুলি ঠেকাইবার কোনরূপ বিধি-ব্যবস্থা শাস্ত্রগ্রন্থে আছে কি না, সম্প্রতি তাহাই খুঁজিয়া দেখ। যদি না থাকে, প্রস্তুত কর; তাহাতেও দোষ নাই; বিপদে রক্ষা করাই ত আইনের কাজ। কিন্তু উদ্দেশ্য ও আবশ্যক যত বড় হউক, প্রস্তুত' শব্দটা শুনিবামাত্রই হয়ত পণ্ডিতদের দল চেঁচাইয়া উঠিবেন। আরে এ বলে কি! এ কি যার-তার শাস্ত্র যে, আবশ্যকমত দুটো কথা বানাইয়া লইব? এ যে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ। অপৌরুষেয়—অন্ততঃ ঋষিদের তৈরি, যাঁরা ভগবানের কৃপায় ভূত-ভবিষ্যত সমস্ত জানিয়া শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ কথা তাঁরা স্মরণ করেন না যে, এটা শুধু হিন্দুর উপরেই ভগবানের দয়া নয়—এমনি দয়া সব জাতির প্রতিই তিনি করিয়া গিয়াছেন।

ইহুদিরাও বলে তাই, খ্রীষ্টান, মুসলমান—তারাও তাই বলে। কেহই বলে না যে, তাহাদের ধর্ম এবং শাস্ত্রগ্রন্থ, সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার ফল। এ বিষয়ে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষ কোন একটা বিশেষত্ব আমি ত দেখিতে পাই না। সকলেরই যেমন করিয়া পাওয়া, আমাদেরও তেমনি করিয়া পাওয়া। সে যাই হউক, আবশ্যক হইলে শাস্ত্রীয় শ্লোক একটা বদলাইয়া যদি আর একটা নাও করা যায় —নতুন একটা রচনা করিয়া বেশ দেওয়া যায়। এবং এমন কাণ্ড বহুবার হইয়াও গিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। আর তাই যদি না হইবে, তবে যে-কোন একটা বিধি-নিষেধের এত প্রকার অর্থ, এত প্রকার তাৎপর্য পাওয়া যায় কেন?

এই ভারতবর্ষ কাগজেই অনেকদিন পূর্বে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশবাবু বলিয়াছিলেন, "না জানিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না!" কিন্তু, আমি ত বলি, সেই একমাত্র কাজ, যাহা শাস্ত্র না জানিয়া পারা যায়। কারণ, জানিলে তাহার আর শাস্ত্রের দোহাই পাড়িবার কিছুমাত্র জো থাকে না। তখন 'বাঁশবনে ডোম কানা' হওয়ার মত সে ত নিজেই কোনদিকে কূল-কিনারা খুঁজিয়া পায় না; সুতরাং, কথায় কথায় সে শাস্ত্রের দোহাই দিতেও যেমন পারে না, মতের অনৈক্য হইলেই বচনের মুগুর হাতে করিয়া তাড়িয়া মারিতে যাইতেও তাহার তেমনি লজ্জা করে।

এই কাজটা তাহারাই ভাল পারে, যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের পুঁজি যৎসামান্য। এবং ঐ জোরে তাহারা অমন নিঃসঙ্কোচে শাস্ত্রের দোহাই মানিয়া নিজের মত গায়ের জোরে জাহির করে এবং নিজেদের বিদ্যার বাহিরে সমস্ত আচার-ব্যবহারই অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিন্দা করে।

কিন্তু মানবের মনের গতি বিচিত্র: তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য। তাহার সুখ-দুঃখের ধারণা বহুপ্রকার। কালের পরিবর্তন ও উন্নতি অবনতির তালে তালে সমাজের মধ্যে সে নানাবিধ জটিলতার

সৃষ্টি করে। চিরদিন করিয়াছে এবং চিরদিনই করিবে। ইহার মধ্যে সমাজ যদি নিজেকে অদম্য অপরিবর্তনীয় কল্পনা করিয়া, ঋষিদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর বরাত দিয়া, নির্ভয়ে পাথরের মত কঠিন হইয়া থাকিবার সঙ্কল্প করে ত তাহাকে মরিতেই হইবে। এই নির্বুদ্ধিতার দোষে অনেক বিশিষ্ট সমাজও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দুর্ঘটনা বিরল নয়; কিন্তু আমাদের এই সমাজ, মুখে সে যাই বলুক, কিন্তু কাজে যে সত্যই মুনিঋষির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া তাহার শাস্ত্র জিনিসটিকে লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই, তাহার সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সে সমাজ এখনও টিকিয়া আছে। বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ত বাঁচিয়া থাকা। সুতরাং সে যখন বাঁচিয়া আছে, তখন যে-কোন উপায়ে, যে-কোন কলাকৌশলের দ্বারা সে যে এই সামঞ্জস্য করিয়া আসিয়াছে, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ।

সর্বত্রই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সামঞ্জস্য প্রধানতঃ যে উপায়ে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে— তাহা প্রকাশ্যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া নহে। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে যে, নব-রচিত শ্লোক বেনামীতে এবং প্রাচীনতার ছাপ লাগাইয়া চালাইয়া দিতে পারিলেই তবে ছুটিয়া চলে, না হইলে খোঁড়াইতে থাকে। অতএব নিজের জোরে নূতন শ্লোক তৈরি করা প্রকৃষ্ট উপায় নহে। প্রকৃষ্ট উপায় ব্যাখ্যা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—পুরাতন সভ্য-সমাজের মধ্যে শুধু গ্রীক ও রোম ছাড়া আর সকল জাতি এই দাবী করিয়াছে,—তাহাদের শাস্ত্র ঈশ্বরের দান। অথচ, সকলকেই নিজেদের বর্ধনশীল সমাজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এই ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের পরিসর ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিতে হইয়াছে। এবং সে-বিষয়ে সকলেই প্রায় এক পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন বর্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া।

কোন জিনিসের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করা যায় তিন প্রকারে। প্রথম ব্যাকরণগত ধাতুপ্রত্যয়ের জোরে; দ্বিতীয়—পূর্ব এবং পরবর্তী শ্লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচার করিয়া; এবং তৃতীয়—কোন বিশেষ দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে শ্লোকটি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিয়া। অর্থাৎ চেষ্টা করিলেই দেখা যায় যে, চিরদিন সমাজ-পরিচালকেরা নিজেদের হাতে এই তিনখানি হাতিয়ার—ব্যাকরণ, সম্বন্ধ এবং তাৎপর্য (positive and negative) লইয়া ঈশ্বরদত্ত যে-কোন শাস্ত্রীয় শ্লোকের যে-কোন অর্থ করিয়া পরবর্তী যুগের নিত্য নূতন সামাজিক প্রয়োজন ও তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাকে সজীব রাখিয়া আসিয়াছেন।

আজ যদি আমাদের জাতীয় ইতিহাস থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—কেন শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা এমন করিয়া পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং কেনই বা এত মুনির এত রকম মত প্রচলিত হইয়াছে এবং কেনই বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে শাস্ত্র বোঝাই হইয়া গিয়াছে। সমাজের এই ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়াই এখন আমরা ধরিতে পারি না—অমুক শাস্ত্রের অমুক বিধি কিজন্য প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং কিজন্যই বা অমুক শাস্ত্রের দ্বারা তাহাই বাধিত হইয়াছিল। আজ সুদূরে দাঁড়াইয়া সবগুলি আমাদের চোখে এইরূপ দেখায়। কিন্তু, যদি তাহাদের নিকটে যাইয়া দেখিবার কোন পথ থাকিত ত নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—এই দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ বিধি একই স্থানে দাঁড়াইয়া আঁচড়া-আঁচাড় করিতেছে না। একটি হয়ত আর-একটির শতবর্ষ পিছনে দাঁড়াইয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে।

প্রবাহই জীবন। মানুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ একটা ধারা তাহার ভিতর দিয়া অনুক্ষণ বহিয়া যাইতে থাকে। বাহিরের প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুকে সে গ্রহণও করে, আবার ত্যাগও করে। যাহাতে তাহার আবশ্যক নাই, যে বস্তু দূষিত, তাহাকে

পরিবর্জন করাই তাহার প্রাণের ধর্ম। কিন্তু মরিলে আর যখন ত্যাগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তখনই তাহাতে বাহির হইতে যাহা আসে, তাহারা কায়েম হইয়া বসিয়া যায় এবং মৃতদেহটাকে পচাইয়া তোলে। জীবন্ত সমাজ এ নিয়ম স্বভাবতই জানে। সে জানে, যে বস্তু আর তাহার কাজে লাগিতেছে না, মমতা করিয়া তাহাকে ঘরে রাখিলে মরিতেই হইবে। সে জানে, আবর্জনার মত তাহাকে ঝাঁটাইয়া না ফেলিয়া দিয়া, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়াইলে অনর্থক শক্তিক্ষয় হইতে থাকিবে, এবং এই ক্ষয়ই একদিন তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঢালিয়া দিবে।

কিন্তু জীবনীশক্তি যত হ্রাস পাইতে থাকে, প্রবাহ যতই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া আসিতে থাকে, যতই তাহার দুর্বলতা দুষ্টের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে ভয় পায়, ততই তাহার ঘরে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ভাল-মন্দের বোঝা জমাটি বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। এবং সেই সমস্ত গুরুভার মাথায় লইয়া সেই জরাতুর মরণোন্মুখ সমাজকে কোনমতে লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সেই শেষ আশ্রয় যমের বাড়ির পথেই যাইতে হয়।

ইহার কাছে এখন সমস্তই সমান—ভালও যা, মন্দও তাই ; সাদাও যেমন, কালও তেমনই। কারণ জানিলে তবেই কাজ করা যায়, অবস্থার সহিত পরিচয় থাকিলেই তবে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এখানকার এই জরাতুর সমাজ জানেই না—কিজন্য বিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল, কেনই বা তাহা প্রকারন্তরে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের কোন্ দুঃখ সে দূর করিতে চাহিয়াছিল, কিংবা কোন্ পাপের আক্রমণ হইতে সে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই অর্গল টানিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। নিজের বিচার-শক্তি ইহার নাই, পরের কাছেও যে সমস্ত গন্ধমাদন তুলিয়া লইয়া হাজির করিবে—সে জোরও ইহার গিয়াছে। সুতরাং, এখন এ শুধু এই বলিয়া তর্ক করে যে, এই-সকল

শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ আমাদেরই ভগবান ও পরমপূজ্য মুনিঋষির তৈরী। এই তপোবনেই তাঁরা মৃতসঞ্জীবনী লতাটি পুঁতিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং, যদিচ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও নিরর্থক ব্যাখ্যারূপ গুল্ম ও কণ্টকতৃণে এই তপোবনের মাঠটি সম্প্রতি সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই পরম শ্রেয়ঃ ইহারই মধ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেই। অতএব আইস, হে সনাতন হিন্দুর দল, আমরা এই হোম-ধূপ-পূত মাঠের সমস্ত ঘাস ও তৃণ চক্ষু মুদিয়া নির্বিকারে চর্বণ করিতে থাকি। আমরা অমৃতের পুত্র—সুতরাং সেই অমৃত-লতাটি একদিন যে আমাদের দীর্ঘ জিহ্বায় আটক খাইবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ইহাতে সংশয় না থাকিতে পারে। কিন্তু অমৃতের সকল সন্তানই কাঁচা ঘাস হজম করিতে পারিবে কি না, তাহাতেও কি সংশয় নাই!

কিন্তু আমি বলি, এই উদর এবং জিহ্বার উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধি এবং দৃষ্টিশক্তির সাহায্য লইয়া কাঁটাগাছগুলা বাছিয়া ফেলিয়া, সেই অমৃত-লতাটির সন্ধান করিলে কি কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং মানুষের মত দেখিতে হয় না?

ভাগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন কিজন্য? সে কি শুধু আর একজনের লেখা শাস্ত্রীয় শ্লোক মুখস্থ করিবার জন্য? এবং একজন তাহার কি টীকা করিয়াছেন, এবং আর একজন সে টীকার কি অর্থ করিয়াছেন—তাহাই বুঝিবার জন্য? বুদ্ধির আর কি কোন স্বাধীন কাজ নাই? কিন্তু বুদ্ধির কথা তুলিলেই পণ্ডিতেরা লাফাইয়া উঠেন; ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার চীৎকার করিতে থাকেন। শাস্ত্রের মধ্যে বুদ্ধি খাটাইবে কোন্‌খানে? এ যে শাস্ত্র! তাদের বিশ্বাস, শাস্ত্রীয় বিচার শুধু শাস্ত্রকথার লড়াই। তাহার হেতু, কারণ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সত্য মিথ্যা, এ-সকল নিরূপণ করা নয়। শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা কতকাল হইতে যে এরূপ অবনত হীন হইয়া পড়িয়াছেন,

তাহা জানিবার উপায় নাই—কিন্তু এখন তাঁহাদের একমাত্র ধারণা যে, ব্রহ্মপুরাণের কুস্তির প্যাঁচ বায়ুপুরাণ দিয়া খসাইতে হইবে। আর পরাশরের লাঠির মার হারীতের লাঠিতে ঠেকাইতে হইবে। আর কোন পথ নাই। সুতরাং, যে ব্যক্তি এই কাজটা যত ভাল পারেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত। ইহার মধ্যে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তির স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধির কোন স্থানই নাই। করণ, সে শ্লোক ও ভাষ্য মুখস্থ করে নাই।

অতএব, হে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি! তুমি শুধু তোমাদের সমাজের নিরপেক্ষ দর্শকের মত মিটমিট করিয়া চাহিয়া থাক, এবং শাস্ত্রীয় বিচারের আসরে স্মৃতিবত্ন আর তর্করত্ন কণ্ঠস্থ শ্লোকের গদ্‌কা ভাঁজিয়া যখন আসর গরম করিয়া তুলিবেন, তখন হাততালি দাও।

কিন্তু তামাশা এই যে, জিজ্ঞাসা করিলে এইসব পণ্ডিতেরা বলিতেও পারিবেন না—কেন তাঁরা ও-রকম উন্মত্তের মত ওই যন্ত্রটা ঘুরাইয়া ফিরিতেছেন। এবং কি তাঁদের উদ্দেশ্য! কেনই বা এই আচারটা ভাল বলিতেছেন এবং কেনই বা এটার বিরুদ্ধে এমন বাঁকিয়া বসিতেছেন। যদি প্রশ্ন করা যায়, তখনকাব দিনে যে উদ্দেশ্য বা যে দুঃখের নিষ্কৃতি দেবার জন্য অমুক বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল—এখনও কি তাই আছে; ইহাতেই কি মঙ্গল হইবে? প্রত্যুত্তরে স্মৃতিরত্ন তাঁহার গদ্‌কা বাহির করিয়া তোমার সম্মুখে ঘুরাইতে থাকিবেন, যতক্ষণ না তুমি ভীত ও হতাশ হইয়া চলিয়া যাও।

এইখানে আমি একটি প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তাহাতে আপনা হইতেই অনেক কথা পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। প্রবন্ধটি অধ্যাপক শ্রীভবিভূতি ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ এম. এ. লিখিত 'ঋগ্বেদে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও আচার' ভারতবর্ষে প্রথমেই ছাপা হইয়া বোধ করি, ইহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কিন্তু আমি আকৃষ্ট হইয়াছি, ইহার শাস্ত্রীয় বিচারের সনাতন

পদ্ধতিতে, ইহার ঝাঁজে এবং রৌদ্র, করুণ প্রভৃতি রসের উত্তাপে এবং উচ্ছ্বাসে।

প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের সেই কথাটি মনে পড়িয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রীয় বিচারে যিনি মাথা গরম করেন, তিনি দুর্বল। এইজন্য একবার মনে করিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধের সমালোচনা না করাই উচিত। কিন্তু ঠিক এই ধরনের আর কোন প্রবন্ধ হাতের কাছে না পাওয়ায় শেষে বাধ্য হইয়া ইহারই আলোচনাকে ভূমিকা করিতে হইল। কারণ, আমি যাহার মূল্য-নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই কতকটা আভাস এই 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে ভববিভূতি মহাশয় স্বর্গীয় রমেশ দত্তের উপর ভারী খাপ্পা হইয়াছেন। প্রথম কারণ, তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বানগণের অন্যতম। এই পাপে তাঁর টাইটেল দেওয়া হইয়াছে 'পদাঙ্কানুসারী রমেশ দত্ত'—যেমন মহামহোপাধ্যায় অমুক, রায় বাহাদুর অমুক, এই প্রকার। যেখানেই স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় উল্লিখিত হইয়াছেন, সেইখানেই এই টাইটেলটি বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় এবং ক্রোধের মুখ্য কারণ বোধ করি এই, 'পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীহৃষিকেশ শাস্ত্রী মহাশয়' তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বের ৪৫ পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীকাশীরাম বাচস্পতির টীকার নকল করিয়া 'অগ্নে' লেখা সত্ত্বেও এই পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদকটা 'অগ্নে' লিখিয়াছে। শুধু তাই নয়। আবার 'অগ্নে' শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত পর্যন্ত মনে করিয়াছে। সুতরাং এই অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নানাপ্রকার রসের উৎসব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যথা—"স্তম্ভিত হইবেন, লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হইবেন এবং যদি একবিন্দুও আযরক্ত আপনাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়, তবে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। সব উচ্ছ্বাসগুলি লিখিতে গেলে সে অনেক স্থান এবং সময়ের আবশ্যক।

সুতরাং তাহাতে কাজ নাই; যাঁহার অতিরুচি হয়, তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মূল প্রবন্ধে দেখিয়া লইবেন। তথাপি এ-সকল কথা আমি তুলিতাম না। কিন্তু এই দুটা কথা আমি সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চাই, আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় বিচার এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা কিরূপ ব্যক্তিগত ও নিরর্থক উচ্ছ্বাসপূর্ণ হইয়া উঠে। এবং উৎকট গোঁড়ামি ধমনীর আর্যরক্তে এমন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য বাধাইয়া দিলে মুখ দিয়া শুধু যে মান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপভাষাই বাহির হয়, তাহা নয়, এমন সব যুক্ত বাহির হয়, যাহা শাস্ত্রীয় বিচারেই বল, আর যে-কোন বিচারেই বল, কোন কাজেই লাগে না। কিন্তু স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের অপবাধটা কি? পণ্ডিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকে। সে কি মারাত্মক অপরাধ? পাশ্চাত্য পণ্ডিত কি পণ্ডিত নন যে, তাঁহার মতানুযাযী হইলেই গালিগালাজ খাইতে হইবে।

দ্বিতীয় বিবাদ ঋক্‌বেদের 'অগ্নে' শব্দ লইয়া। এই পদাঙ্কানুসাবী লোকটা বিবাদ ঋক্‌বেদের 'অগ্নে' শব্দ লইয়া। এই পদাঙ্কানুসারী লোকটা কেন যে জানিয়া শুনিয়াও এ শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া 'অগ্রে' পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল, সে আলোচনা পরে হইবে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব কি জানা নাই যে, বাংলার অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়াও অনেক প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকেব অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, বুদ্ধিপূর্বক নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা যদি কোন শাস্ত্রীয় শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলাই ত শাস্ত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা।

জ্ঞানতঃ চাপাচুপি দিয়া রাখা বা অজ্ঞানতঃ প্রত্যেক অনুস্বার বিসর্গটিকে পর্যন্ত নির্বিচারে সত্য বলিয়া প্রচার করায় কোন পৌরুষ নাই। তাহাতে শাস্ত্রেরও মান্য বাড়ে না, ধর্মকেও খাটো করা হয়।

বরঞ্চ, যাহাদের শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই, শুধু তাহাদেরই এই ভয় হয়, পাছে দুই-একটা কথাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা পড়িলে সমস্ত বস্তুটাই ঝুটা হইয়া ছায়াবাজির মত মিলাইয়া যায়। সুতরাং যাহা কিছু সংস্কৃত শ্লোকের আকারে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার সমস্তটাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া মানা চাই-ই।

বস্তুতঃ এই সত্য ও স্বাধীন বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই হিন্দুর শাস্ত্ররাশি এমন অধঃপতিত হইয়াছে। নিছক নিজের বা দলটির সুবিধার জন্য কত যে রাশি রাশি মিথ্যা উপন্যাস রচিত এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, কত অসত্য যে বেনামীতে প্রাচীনতার ছাপ মাখিয়া ভগবানের অনুশাসন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে মান্য করাও কি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করা? একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। কুলার্ণবের "আমিষাসবসৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তী স বজ্জ্যাশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ" ইহাও হিন্দুর শাস্ত্র। এ কথাও ভগবান মহাদেব বলিয়া দিয়াছেন। চব্বিশ ঘণ্টা মুখে মদ-মাংসের সুগন্ধ না থাকিলে সে একটা অন্ত্যজ জানোয়ারের সামিল। অধিকারিভেদে এই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দ্বারাও হিন্দু স্বর্গের আশা করে! কিন্তু তান্ত্রিকই হউক, আর যাই হউক, সে হিন্দু ত বটে। ইহা শাস্ত্রীয় বিধি ত বটে! সুতরাং স্বর্গবাসও ত সুনিশ্চিত বটে! কিন্তু, তবুও যদি কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত humbug বলিয়া হাসিয়া উঠেন, তাঁহার হাসি থামাইবারও ত কোন সদুপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

অথচ হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া শ্লোকটিকে মিথ্যা বলাতেও শঙ্কা আছে। কারণ, আর দশটা হিন্দু-শাস্ত্র হইতে হয়ত বচন বাহির হইয়া পড়িবে যে, মহেশ্বরের তৈরী এই শ্লোকটিকে যদি কেহ সন্দেহ করে, তাহা হইলে সে ত সে, তাহার ৫৬ পুরুষ নরকে যাইবে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র ত সচরাচর একপুরুষ লইয়া বড়-একটা কথা কহে না!

শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহোদয় তাঁহার 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' ও আচার' প্রবন্ধের গোড়াতেই চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"যে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা হিন্দু জাতির একটি মহৎ বিশেষত্ব, যাহা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিতে দৃষ্ট হয় না—যে সনাতন সুপ্রথা ও সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়,—যাহাকে কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বান্‌গণ হিন্দুর প্রধান ভ্রম এবং তাঁহাদের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন,—সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য কত প্রাচীন, তাহা জানিতে হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়।"

এই চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রসঙ্গে শুধু যদি ইনি লিখিতেন—এই কথা কত প্রাচীন, তাহা জানিতে হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না; কারণ, উক্ত প্রবন্ধে বলিবার বিষয়ই এই। কিন্তু ঐ যে-সর্ব আনুষঙ্গিক বক্র কটাক্ষ, সার্থকতা কোনখানে? "যে সনাতন সুপ্রথা শান্তি ও সমাজ-পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়—" জিজ্ঞাসা করি, কেন? কে বলিয়াছে? ইহা যে 'সুপ্রথা' তাহার প্রমাণ কোথায়? যে-কোন একটা প্রথা শুধু পুরাতন হইলেই 'সু' হয় না। ফিজিয়ানরা যদি জবাব দেয়, "মশাই, বুড়া বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতিয়া ফ্যালার নিয়ম যে আমাদের দেশের কত প্রাচীন, সে যদি একবার জানিতে ত আর আমাদের দোষ দিতে না।"

সুতরাং এই যুক্তিতে ত ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে, "হাঁ বাপু, তোমার কথাটা সঙ্গত বটে। এ-প্রথা যখন এতই প্রাচীন, তখন আর ত কোন দোষ নাই। তোমাকে নিষেধ করিয়া অন্যায় করিয়াছি—বেশ করিয়া জ্যান্ত কবর দাও—এমন সুবন্দোবস্ত আর হইতেই পারে না। "অতএব শুধু প্রাচীনত্বই কোন বস্তুর ভাল-মন্দর সাফাই নয়। তবে এই যে বলা হইয়াছে যে, এই প্রথা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত নহে, ইহা সেই পরমপুরুষের একটি 'অঙ্গ-

বিলাস' মাত্র, তাহা হইলে আর কথা চলে না। কিন্তু আমার কথা চলুক আর না-চলুক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু যাহাতে যথার্থই আসিয়া যায় অন্ততঃ আসিয়া গিয়াছে; তাহা এই যে, সেই সমস্ত প্রাচীন দিনের ঋষিদিগে· অপরিমেয় অতুল্য বুদ্ধিরাশির ভরা-নৌকা এইখানেই ঘা খাইয়া চিরদিনের মত ডুবিয়াছে। যে-কেহ হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই বোধ করি অত্যন্ত ব্যথার সহিত অনুভব করিয়াছেন, কি করিয়া ঋষিদিগের স্বাধীন চিন্তার শৃঙ্খল এই বেদেরই তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্নভিন্ন হইয়া পথে-বিপথে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করিয়া আজ পড়িয়া আছ। চোখ মেলিলেই দেখা যায়, যখনই সেই সমস্ত বিপুল চিন্তার ধারা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিব অনুসরণ কবিয়া ছুটিতে গিয়াছে, তখনই বেদ তাহার দুই হাত বাড়াইয়া তাহাদের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আর একদিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহাদিগকে ফিরাইয়াছে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসাবী দেশীয় বিদ্বান্‌গণকে ঠিক তেমন কবিয়া নিবৃত্ত কবা শক্ত। কিন্তু সে যাই হউক, কেন যে তাঁহারা এই প্রথমটিকে হিন্দুর ভ্রম এবং অধঃপতনের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অধ্যাপক মহাশয় তাহার যখন কিছুমাত্র হেতুর উল্লেখ না করিয়া শুধু উক্তিটা তুলিয়া দিয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইহা লইয়া আলোচনা আপাততঃ প্রয়োজন অনুভব করি না।

অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় বলেন বৈদশিক পণ্ডিতেরা পরমপুরুষের এই চাতুর্ব্বর্ণ্য অঙ্গবিলাসটি মানিতে চাহেন না এবং বলেন ঋক্‌বেদের সময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্য ছিল না। কারণ, এই বেদের আদ্য কতিপয় মণ্ডলে ভারতবাসিগণের কেবল দ্বিবিধ ভেদের উল্লেখ আছে। আর যদিই বা কোনস্থানে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উল্লেখ থাকে, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত।

এই কথায় অধ্যাপক মহাশয় ইহাদিগকে অন্ধ বলিয়া ক্রোধে ইহাদের চোখে আঙুল দিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। কারণ,

আর্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুর্বিধ ভেদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিতেও তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

তার পর "আর্য্যং বর্ণং' শব্দটার অর্থ লইয়া উভয় পক্ষের যৎকিঞ্চিৎ বচসা আছে। কিন্তু আমরা ত বেদ জানি না, সুতরাং এই 'আর্য্যং বর্ণং' শেষে কি মানে হইল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

তবে মোটামুটি বুঝা গেল যে, এই 'ব্রাহ্মণ' শব্দটা লইয়া একটু গোল আছে। কারণ, 'ব্রহ্ম' শব্দটির 'মন্ত্র' অর্থও নাকি হয়।

অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, ম্যাক্সমূলারের এত সাহস হয় নাই যে বলেন, 'ছিলই না', কিন্তু প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, হিন্দু চাতুর্বর্ণ্য বৈদিক যুগে 'স্পষ্টতঃ বিদ্যমান ছিল না'; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যে বিভিন্ন বৃত্তির কথা শুনা যায়—তাহার তত বাঁধাবাঁধি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে তৎকালে আবির্ভূত হয় নাই—অর্থাৎ যোগ্যতা-অনুসারে যে-কোন লোক যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত।

আমার ত মনে হয়, পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার জোর করিয়া 'ছিলই না' না বলিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাতেই শুধু অর্জিত হয়। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ভববিভূতিবাবু বলিতেছেন,—"সায়ণ চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া না হয় তাঁহার ব্যাখ্যা উড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতে পার, কিন্তু সেই অপৌরুষেয় বেদেরই অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রহ্মণ যখন 'ব্রাহ্মণস্পতি' অর্থে ব্রাহ্মণপুরোহিত [ঐ. ব্রা. ৮।৫।২৫, ২৬] করিলেন, তখন তাহা কি বলিয়া উড়াইয়া দিবে? ব্রহ্মণ্যশক্তি যে সমাজ ও রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল, তাহা আমরা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই!"

পাওয়াই ত উচিত। কিন্তু কে উড়াইয়া দিতেছে এবং দিবার প্রয়োজনই বা কি হইয়াছে, তাহা ত বুঝা গেল না। ব্রাহ্মণ পুরোহিত—বেশ ত! পুরোহিতের কাজ যিনি করিতেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হইত। যজন-যাজন করিলে ব্রাহ্মণ বলিত; যুদ্ধ, রাজ্য-

পালন করিলে ক্ষত্রিয় বলিত—এ কথা ত তাঁহারা কোথাও অস্বীকার করেন নাই। আদালতে বসিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদিগকে জজ বলে, উকিল বলে না। শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবু যখন ওকালতি করিতেন, তাঁহাকে লোকে উকিল বলিত, জজ হইলে জজ বলিত। ইহাতে আশ্চর্য হইবার আছে কি? ব্রাহ্মণ্যশক্তি বৈদিক যুগে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল। ইংরাজের আমলে বড়লাট ও মেম্বারেরা তাহাই, সুতরাং এই মেম্বারেরা রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল। বলিয়া একটা কথা যদি ভারতবর্ষের ইংরাজী ইতিহাসে পাওয়া যায় ত তাহাতে বিস্মিত হইবার বা তর্ক করিবার আছে কি? অথচ লাটের ছেলেরা লাটও হয় না, মেম্বার বলিয়াও কোন স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব নাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রাচীনতা সম্বন্ধে শুনিতে পাই, নানাপ্রকার মতভেদ আছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একটি অতিবড় অপকর্ম করিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছেন—"কবষ শূদ্র হইয়াও দশম মণ্ডলের অনেকগুলি মন্ত্রের প্রণেতা (?)।"

'দ্রষ্টা' বলা তাঁহার উচিত ছিল। এই হেতু ভববিভূতিবাবু ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া (?) চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু আমি বলি, বিদেশীর সম্বন্ধে অত খুঁটিনাটি ধরিতে নাই। কারণ, এই দশম মণ্ডলেরই ৮৫ সূক্তে সোম ও সূর্যের বিবাহ বর্ণনা করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন, এমন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আকাশের গ্রহ-তারার সম্বন্ধ বাঁচিবার চেষ্টা জগতের আর কোন সাহিত্যে দেখা না যাইতে পারে; কিন্তু কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায় বৈদিক কবিকে যে শ্লোকটি বিশেষ করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, তাহাকে বিদেশীয় কেহ যদি সেই কবির রচিত বলিয়া মনে করে, তাহাতে রাগ করিতে আছে কি? কিন্তু সে যাই হোক, সূক্তটি যে রূপকমাত্র, তাহা ভববিভূতিবাবু নিজেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অপৌরুষেয় বেদের অন্তর্গত সূক্তরাশির মধ্যেও

সূক্ত রহিয়াছে, যাহা রূপকমাত্র, অতএব খাঁটি সত্য হইতে বাছিয়া ফেলা অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যক কাজটি যাহাকে দিয়া করাইতে হইবে, সে বস্তু কিন্তু বিশ্বাসপরায়ণতা বা ভক্তি নহে—সে মানুষের সংশয় এবং তর্কবুদ্ধি! অতএব ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাহাকেই সকলের উপর স্থান দান করিতেই হইবে। না করিলে মানুষ মানুষই হইতে পারে না। কিন্তু, এই মনুষ্যত্ব দিরদিন সমভাবে থাকে না—সেইজন্য ইহাও কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, হয়ত এই ভারতেই একদিন ছিল, যখন এই চন্দ্র ও সূর্যের বিবাহ-ব্যাপারটা খাঁটি সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে মানুষ ইতস্ততঃ করে নাই। আবার আজ যাহাকে সত্য বলিয়া আমরা অসংশয়ে বিশ্বাস করিতেছি, তাহাকেই হয়ত আমাদের বংশধরেরা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবে! আজ আমরা জানি, সূর্য এবং চন্দ্র কি বস্তু এবং এইরূপ বিবাহ-ব্যাপারটাও কিরূপ অসম্ভব; তাই ইহাকে রূপক বলিতেছি। কিন্তু এই সূক্তই যদি আজ কোন পল্লীবাসিনী বৃদ্ধা নারীর কাছে বিবৃত করিয়া বলি, তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিবেন না। কিন্তু তাহাতে কি বেদের মাহাত্ম বৃদ্ধি করিবে? ভববিভূতিবাবু ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত উদ্ধৃত করিতে গিয়া কঠিন হইয়া বলিতেছেন,—"ইহাতেও কাহারও সন্দেহ থাকিলে তাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত বা প্রখ্যাত 'পুরুষসূক্তের' দ্বাদশ ঋক্‌টি দেখাইয়া দিব, যথা—

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্য কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈস্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

অর্থ—সেই পরমপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। ইহার অপেক্ষা চাতুর্ব্বর্ণ্যের আর স্পষ্ট উল্লেখ কি হইতে পারে?"

এই সূক্তটির বিচার পরে হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উদ্দেশ্য ভববিভূতিবাবু যাহা

ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইনি বলিতেছেন যে, "আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের ভারতীয় সভ্যতাকে আধুনিকরূপে জগৎসমক্ষে প্রচার করা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া ইত্যাদি—"

এরূপ উদ্দেশ্যকে সকলেই নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যেরই একটা অর্থ থাকে। এখানে অর্থটা কি? একটা সত্য বস্তুর কদর্য বা কু-অর্থ করার হেয় উপায় অবলম্বন করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যকে বৈদিক যুগ হইতে নির্বাসিত করিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিপন্ন করায় এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের লাভটা কি? চাতুর্ব্বর্ণ্যই কি সভ্যতা? ইহাই কি বেদের সর্বপ্রধান রত্ন? চাতুর্ব্বর্ণ্যই বৈদিক যুগে থাকার প্রমাণ আমরা দাখিল না করিতে পারিলেই কি জগৎসমক্ষে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে যে, আমাদের পিতামহেরা বৈদিক যুগে অসভ্য ছিল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মিশর, বেবিলন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা ৮/১০ হাজার বৎসর পূর্বের বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বেলায় তাঁহাদের এতটা নীচতা প্রকাশ করিবার হেতু কি?

তা ছাড়া, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত ভববিভূতিবাবুর এই মন্তব্য খাপ খায় না। আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না (এবং বইখানাও হাতের কাছে নাই), কিন্তু মনে যেন পড়িতেছে, যিনি Kant–এর Critique of the pure Reason-এর ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—জগতে আসিয়া যদি কিছু শিখিয়া থাকি ত সে ঋক্‌বেদ ও এই Critique হইতে। একটা গ্রন্থের ভূমিকায় আর একটা গ্রন্থের উল্লেখ এমন অযাচিতভাবে করা সহজ শ্রদ্ধার কথা নয়।

তবে যে কেন তিনি ইহাকেই খাটো করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়া

আশাতীত সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভববিভূতিবাবু বলিতে পারেন। যাই হউক, এই 'হিন্দুজাতিব প্রাণস্বরূপ' ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তটি অপৌরুষেয় ঋক্‌বেদেরই অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদক তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করায় ভচবিভূতি মহাশয় "বড়ই কাতরকণ্ঠে দেশের আশা-ভবাসাস্থল ছাত্রবৃন্দ ব্রাহ্মণতনয়গণ"কে ডাকাডাকি কবিতেছেন, সেই সূক্তটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও ডাক দেওয়া উচিত নয়। ইতিপূর্বেই এই ১০ম মণ্ডলেবই ৮৫ সূক্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রখ্যাত ৯০ সূক্তটি কি! ইহা পরমপুরুষের মুখ-হাত-পা দিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতিব তৈরী হওয়ার কথা। কিন্তু ইহা জটাপাঠ, পদপাঠ শাকল, বাস্কল দিয়া যতই যাচাই হইয়া গিয়া থাকুক না কেন, বিশ্বাস কবিতে হইলে অন্ততঃ আরও শ-চাবেক বৎসর পিছাইয়া যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে যখন সম্ভব নহে, তখন আধুনিক কালে সংসারের চৌদ্দ আনা শিক্ষিত সভ্য লোক যাহা বিশ্বাস করেন—সেই অভিব্যক্তির পর্যায়েই মানুষের জন্ম হইয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে। তার পর কোটি কোটি বৎসর নানাভাবে তাহার দিন কাটিয়া, শুধু কাল, না হয় পরশু সে সভ্যতার মুখ দেখিযাছে। এ-পৃথিবীর উপব মানবজন্মেব তুলনায় চাতুর্বর্ণ্য ঋগ্বেদে থাকুক আর না-থাকুক, সে কালকের কথা। অতএব হিন্দুজাতিব প্রাণস্বরূপ এই সূক্তটিতে চাতুবর্ণ্যের সৃষ্টি যেভাবে দৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও খাঁটি সত্য জিনিস নয়—রূপক।

কিন্তু ভয়ানক মিথ্যা, তদপেক্ষা ভয়ানক সত্য মিথ্যায় মিশাইয়া দেওয়া। কারণ, ইহাতে না পারা যায় সহজে মিথ্যাকে বর্জন করা, না যায় নিষ্কলঙ্ক সত্যকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় গ্রহণ করা। অতএব, এই রূপকের মধ্য হইতে নীর ত্যজিয়া ক্ষীর শোষণ করা বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধির

তারতম্য অনুসারে একজন যদি ইহার প্রতি অক্ষরটিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করে এবং আর একজন সমস্ত সূক্তটিকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন অপৌরুষেয়ের দোহাই দিয়া তাহাকে ঠেকাইবে কি করিয়া? সে যদি কহিতে থাকে, ইহাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বৈশ্যের ধর্ম, শূদ্রের ধর্ম—এই চারি প্রকার নির্দেশ করা হইয়াছে, জাতি বা মানুষ নয় অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের মুখ হইতে যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতি এক শ্রেণীর বৃত্তি; তাহাকে ব্রহ্মণ্যধর্ম বা ব্রাহ্মণ বলিবে! হাত হইতে ক্ষত্রিয়—অর্থাৎ বল বা শক্তির ধর্ম। এই প্রকার অর্থ যদি কেহ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাকে না' 'বলিয়া উড়াইয়া দিবে কি করিয়া? কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন করিতে চাহি। এই যে এতক্ষণ ধরিয়া ঠোকাঠুকি কাটাকাটি করিয়া কথার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, তাহা কাহার কি কাজে আসিল? মনের অগোচর ত পাপ নাই? কতকটা বিদ্যা প্রকাশ করা ভিন্ন কোন পক্ষের কাজ হইল কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যদি বলিয়াইছিলেন, চাতুর্বর্ণ্য হিন্দুর বিরাট ভ্রম এবং অধঃপতনের অন্যতম কারণ এবং ইহা ঋক্‌বেদের সময়েও ছিল না—তবে ভবিভূতিবাবু যদি প্রতিবাদই করিলেন, তবে শুধু গায়ের জোরে তাঁদের কথাগুলো উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া কেন প্রমাণ করিয়া দিলেন না, এ-কথা বেদে আছে। কারণ, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার ভুল হইতে পারে না—জাতিভেদ প্রথা সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ-পরিচালনের যে সত্য সত্যই একমাত্র উপায়, তাহা এই সব বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নজির তুলিয়া দিয়া প্রমাণ করিয়া দিলাম। তবে ত তাল ঠুকিয়া বলা যাইতে পারিত, এই দেখ, আমাদের অপৌরুষেয় বেদে যাহা আছে, তাহা মিথ্যাও নয়, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দু ভুলও করে নাই, অধঃপথেও যায় নাই। তা যদি না করিলেন, তবে তাঁহারা জাতিভেদকে ভ্রমই বলুন আর যাই বলুন, সে-কথার উল্লেখ করিয়া শুধু শ্লোকের নজির তুলিয়া উহাদিগকে

কানা বলিয়া, সঙ্কীর্ণচেতা, বলিয়া, আর রাশি রাশি হা-হুতাশ উচ্ছ্বাসের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াই কি কোন কাজ হইবে? বেদের মধ্যে যখন রূপকের স্থান রহিয়াছে, তখন বুদ্ধি-বিচারের অবকাশ আছে। সুতরাং শুধু উক্তিকেই অকাট্য যুক্তি বলিয়া দাঁড় করানো যাইবে না। আমি এই কথাটাই আমার এই ভূমিকায় বলিতে চাহিয়াছি।

অতঃপর হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার বিবাহের কথা। ইনি প্রথমেই বলিতেছেন, "হিন্দুর এই পবিত্র বিবাহপদ্ধতি বহু সহস্র বৎসর পূর্বে,—ঋগ্বেদের সময়ে যেভাবে নিষ্পন্ন হইত, আজও—একালের বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও তাহা অণুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই।" অণুমাত্রও পরিবর্তিত যে হয় নাই, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণে সুস্পষ্ট করিয়াছেন—

"তখনও বরকে কন্যার গৃহে গিয়া বিবাহ করিতে হইত,—এখনও তাহা হইয়া থাকে। আবার বিবাহের পর শোভাযাত্রা করিয়া, বহুবিধ অলঙ্কারভূষিতা কন্যাকে লইয়া শ্বশুর-দত্ত নানাবিধ যৌতুক সহিত তখনও যেমন বর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, এখনও সেইরূপ হইয়া থাকে। বিবাহযোগ্যকালে কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু ঐ বয়সের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই। কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিয়া কর্ত্রীর স্থান অধিকার করিতেন, এবং শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর ও ননদগণের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেন অর্থাৎ সকলকে বশ করিতেন।"

অতঃপর এই সকল উক্তি সপ্রমাণ করিতে নানাবিধ শ্লোক ও মন্তব্য লিখিয়া দিয়া বোধ করি অসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, এই সকল আচার-ব্যবহার বৈদিক কালে প্রচলিত ছিলই। ভালই।

কিন্তু এই যে বলিয়াছেন—বহু সহস্র বর্ষ পূর্বের বিবাহপদ্ধতি যেমনটি ছিল, আজও এই বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও ঠিক তেমনটি আছে, 'অণুমাত্র' পরিবর্তিত হয় নাই—ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিলাম না। কারণ, পরিবর্তিত না হওয়ায় বলিতেই হইবে, আজকাল প্রচলিত বিবাহপদ্ধতিটিও ঠিক তেমনি নির্দোষ এবং ইহাই বোধ করি তাৎপর্য। কিন্তু এই তাৎপর্যটির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। বলিতেছেন,—"কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কন্যার বয়সের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই।" অর্থাৎ বুঝা যাইতেছে, আজকাল যেমন মেয়ের বয়স বারো উত্তীর্ণ হইয়া তেরোয় পড়িলেই ভয়ে এবং ভাবনায় মেয়ের বাপ-মায়ের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠে এবং পাছে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ এবং সমাজে 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হয়, সেই ভয় ও ভাবনায় বাড়িসুদ্ধ লোকের পেটের ভাত চাল হইতে থাকে তখনকার বৈদিক কালে এমনটি হইতে পারিত না। ইচ্ছামত বা সুবিধামত মেয়েকে ১২/১৪/১৮/২০ যে-কোন বয়সেই হউক, পাত্রস্থ করা যাইতে পারিত। আর এমন না হইলে কন্যা শ্বশুরবাড়ি গিয়াই যে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেবরের উপর প্রভু হইয়া বসিয়া যাইত, সে নেহাত কচি খুকীটির কর্ম নয় ত।

রাগ দ্বেষ অভিমান গৃহিণীপনার ইচ্ছা প্রভৃতি যে সেকালে ছিল না—বউ বাড়ি ঢুকিবামাত্রই তাঁহার হাতে লোহার সিন্দুকের চাবিটি শাশুড়ী ননদে তুলিয়া দিত, সেও ত মনে করা যায় না।

যাই হউক, ভববিভূতিবাবুর নিজের কথা মত বয়সের কড়াকড়ি তখন ছিল না। কিন্তু এখন কড়াকড়িটা যে কি ব্যাপার, তাহা আর কোন ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই বোধ করি।

দ্বিতীয়তঃ, ইনি বলিয়াছেন, "এই সকল উপঢৌকন কেহ যেন বর্তমানকালে প্রচলিত কদর্য পণপ্রথার প্রমাণরূপে গ্রহণ না করেন। এগুলি কন্যার পিতার স্বেচ্ছাকৃত, সামর্থ্যানুরূপ দান বুঝিতে হইবে।"

কিন্তু এখানকার উপঢৌকন যোগাইতে অনেক পিতাকে বাস্তু-ভিটাটি পর্যন্ত বেচিতে হয়। সে সময় কিন্তু অপৌরুষেয় ঋক্‌মন্ত্র মেয়ের বাপেরও এক তিল কাজে আসে না, বরের বাপকেও বিন্দুমাত্র

ভয় দেখাইতে, তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে হয় না।

তৃতীয়তঃ রাশীকৃত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, যে-মেয়েব ভাই ছিল না, সে মেয়ের সহিত তখনকার দিনে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এবং বলিতেছেন, অথচ, আজকাল এই বিবাহই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। কারণ, বিষয়-আশয় পাওয়া যায়। যদিচ, এতগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোক ও তাহার অর্থাদি দেওয়া সত্ত্বেও মোটাবুদ্ধিতে আসিল না, ভাই না হওয়ায বোনের অপরাধ কি এবং কেনই বা সে ত্যাজ্যা হইয়াছিল ; কিন্তু এখন যখন ইহাই সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তখন ইহাকেও একটা পবিবর্তন বলিয়াই গণ্য কবিতে হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে।

(১) তখন মেয়ের বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট ছিল না, এখন ইহাই হইয়াছে বাপ-মায়েব মৃত্যুবাণ।

(২) স্বেচ্ছাকৃত উপঢৌকন দাঁড়াইযাছে বাস্তুভিটা বেচা এবং

(৩) নিষিদ্ধ কন্যা হইয়াছেন সবচেয়ে সুসিদ্ধ মেয়ে।

ভববিভূতিবাবু বলিবেন, তা হোক না, কিন্তু এখনও ত বরকে সেই মেয়েব বাড়িতে গিয়াই বিবাহ করিতে হয় এবং শোভাযাত্রা করিয়া ঘরে ফিরিতে হয়। এ ত আর বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষ একতিল পরিবর্তিত করিতে পারে নাই ? তা পারে নাই সত্য, তবুও মনে পড়ে সেই যে কে একজন খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিল,—"অন্নবস্ত্রের দুঃখ ছাড়া আব দুঃখ আমার সংসারে নেই।"

আবার ইহাই সব নয়। "বিবাহিতা পত্নী যে গৃহ জীর্ণারণ্যের তুল্য," তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—এই প্রসিদ্ধ প্রবাদ-বাক্য হইতে সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন। আবার ঋগ্বেদ পাঠেও এই প্রবাদটির সুপুরাতনত্বই সূচিত হইয়াছে। যথা—[৩ম, ৫৩ সূ, ৪ ঋক্]

"জাহেদস্তং মঘবন্ত্ সেতু যোনিঃ

অর্থাৎ হে মঘবন্—জায়াই যোনি। সুতরাং বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুগণ রমণীগণের প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। আবার তাঁহাদের পত্নী কিরূপ মঙ্গলময়ী, তাহা "কল্যাণীর্জায়া···গৃহে তে" [৩ম, ৫৪সূ, ৬ ঋক্] হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়। সুতরাং—

"কিন্তু তথাপি বৈদশিকগণ কেন যে হিন্দুগণের উপর রমণীগণের প্রতি কঠোর ব্যবহারের জন্য দোষারোপ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।"

এই সকল প্রবন্ধ ও মতামতের যে প্রতিবাদ করা আবশ্যক, সে কথা অবশ্য কেহই বলিবেন না। আমিও একেবারেই করিতাম না, যদি না ইহা আমার প্রবন্ধের ভূমিকাহিসাহেবও কাজে লাগিত। তথাপি প্রতিবাদ করিতে আমি চাহি না—কিন্তু ইহারই মত 'বড় কাতরকণ্ঠে ডাকিতে চাহি—ভগবন্! এই সমস্ত শ্লোক আওড়ানোর হাত হইতে এই হতভাগ্য দেশকে রেহাই দাও। ঢের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইয়াছ, এইবার একটু নিষ্কৃতি দাও। —শ্রীমতী অনিলা দেবী। ('ভারতবর্ষ' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)

সমাপ্ত